Registration No.: S/L/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

দ্বাদশ বর্ষ ❖ সংখ্যা ৪ ❖ ডিসেম্বর ২০২২

ধারাবাহিক ঃ

মহাবিশ্বের বিস্ময় ব্ল্যাকহোল

- সম্পাদকীয় ঃ বিজ্ঞানমনস্কতা বনাম রাজনৈতিক সচেতনতা
- ধারাবাহিক ঃ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান – বিশ্ব উষ্ণায়ন কি মানুষের সৃষ্টি?
- নিউট্রন আবিষ্কারের গল্প
- ইনসুলিন আবিষ্কারের শতবর্ষ
- খাবার আমিষ না নিরামিষ না ভেগান

দ্বাদশ বর্ষ❖সংখ্যা - ৪❖ডিসেম্বর ২০২২

ঃ সূচিপত্র ঃ

◈ সম্পাদকীয় ঃ ২

◈ কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা ঃ ৪

◆ বিজ্ঞানীদের নব নির্মিত রামমন্দির পরিদর্শন

◆ ভারত লোকতন্ত্রের জননী ?

◈ চয়ন ঃ ৫

◆ প্রতিদিনের জীবনে জেমস ওয়েবের প্রযুক্তি

◈ কালজয়ী বিজ্ঞানী স্মরণে ঃ ৭

◆ মারি কুরি – এক নিঃশব্দ বিপ্লব

◈ ধারাবাহিক ঃ

◆ মহাবিশ্বের বিস্ময় ঃ ব্ল্যাকহোল ৯

◆ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ১২

◆ মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ ১৮

◈ বিশেষ রচনা ঃ ২১

◆ খাবার আমিষ না নিরামিষ না ভেগান কোন খাবার যুক্তিযুক্ত

◈ বিজ্ঞানের আবিষ্কার ঃ ২৫

◆ নিউট্রন আবিষ্কারের গল্প

◈ অতিথি কলম ঃ ২৯

◆ ইনসুলিন আবিষ্কারের শতবর্ষ – স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ

◈ বিজ্ঞানের খবর ৩৩

◈ বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ ৩৫

◆ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নোবেল পুরস্কার

◈ বিস্মৃত বিজ্ঞানী ঃ ৩৬

◆ ননীগোপাল মজুমদার – বিস্মৃত পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানী

◈ সংগঠন সংবাদ ৩৮

প্রচ্ছদ ঃ মহাকাশ বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একজন শিল্পী *সিগনাস এক্স-ওয়ান* নামক ব্ল্যাক হোলের এই ছবিটি এঁকেছেন। ছবিতে দেখানো হয়েছে ব্ল্যাক হোল'টি তার পাশের নীল তারাটির একাংশকে আকর্ষণ করছে। সৌজন্য ঃ নাসা (NASA/CXC/M.Weiss)

সম্পাদকীয় ঃ

বিজ্ঞানমনস্কতা বনাম রাজনৈতিক সচেতনতা

আজকাল গণমাধ্যম, সমাজ মাধ্যম, আলোচনা সভা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক আলাপচারিতায় বিজ্ঞান ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি প্রায়শই উঠে আসে। এ বিষয়ে সমাজের বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করে থাকেন। অনেকে মনে করেন বিজ্ঞানমনস্কতা ও রাজনৈতিক সচেতনতা পরস্পর সম্পর্কে যুক্ত, একটি অন্যটির পরিপূরক। আবার, অন্যদিকে সমাজে বহু মানুষ আছেন যারা এর বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন বিজ্ঞানে রাজনীতির অনুপ্রবেশ একান্তভাবে বর্জনীয়, কারণ বিজ্ঞান ও রাজনীতি হ'ল পরস্পর সমান্তরালভাবে বয়ে চলা দুটি পৃথক ধারা। বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ ধারা রাজনীতির সংস্পর্শে এলে তা কলুষিত হয়। এই বিশুদ্ধবাদী ধারণা বিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাসকে কেবল অস্বীকারই করে না, প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

ইতিহাস দেখায়, বিভিন্ন যুগে সমাজের পরিচালক গোষ্ঠী সাধারণ মানুষের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ও তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব ও মতবাদের জন্ম দিয়েছে। কখনও রাজা নিজেকে ভগবানের দূত বা প্রতিনিধি হিসাবে প্রচার করে প্রজাকূলের ভীতি ও সমীহ আদায় করেছে। কখনও ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে প্রশাসনের কেন্দ্রে রেখে সমাজ পরিচালকেরা সাধারণ মানুষের উপর শোষণ শাসন চালিয়ে গেছে। যুগে যুগে সমাজপরিচালক ও রাজাদের নীতি অর্থাৎ রাজনীতির আবহে সাধারণ মানুষকে বেঁধে রাখার জন্য সে নিজের দর্শন প্রচার করেছে, শিক্ষাব্যবস্থাকে সাজিয়েছে সেই উদ্দেশ্যে। স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে ধর্মবাদ, অদৃষ্টবাদ, ঈশ্বরবাদ, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদিকে স্থান দেওয়া হয়েছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তবে সমাজ পরিচালকদের কর্মকান্ড একতরফা ছিল না। সমাজের বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী অংশ এর বিরোধিতায় সামিল হয়েছে, সংঘাত হয়েছে যুগে যুগে। রাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত হওয়া বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ যেমন সমাজ পরিচালকদের মতবাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে এক অংশ দাঁড়িয়েছে তার বিপক্ষে। ইতালির পিসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষিত হওয়াঅন্তত ৬ জন ছাত্র পরবর্তীতে পোপ-এর পদে আসীন হয়ে বাইবেল তথা খ্রিস্ট ধর্মের রক্ষক হয়েছিলেন, আবার একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র গ্যালিলিও বাইবেল তথা খ্রিস্ট ধর্মের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত শক্ত করেছিলেন যা সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমস্কতা প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। যুগে যুগে এই দুই মতবাদের সংঘাত বিভিন্ন রূপে সামনে এসেছে।

সমাজের কান্ডারীরা যখনই তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিজ্ঞানের বিকাশের পথকে রুদ্ধ করার প্রয়াস রেখেছে, বিজ্ঞান সচেতন মানুষ তখনই মানুষের স্বার্থবিরোধী রাজনীতির বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই সংঘাতের মধ্য দিয়েই বিজ্ঞান দৃঢ় ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও অগ্রসর হচ্ছে। বিজ্ঞানের বিকাশের এই ইতিহাসকে অস্বীকার করার অর্থ বিজ্ঞানের অপলাপ।

কোন বস্তুর উদ্ভব, বিকাশ অথবা বিলোপ এর কারণ বা নিয়মকে বলা হয় বিজ্ঞান। মানব সমাজও যেহেতু একটি বস্তু, সুতরাং তার উৎপত্তি, বিকাশ ইত্যাদির নিয়মকে তাই বলা হয় সমাজবিজ্ঞান। প্রকৃতি বিজ্ঞান যেমন সমগ্র বস্তুজগতের নিয়মকে ব্যাখ্যা করে তেমনই সমাজবিজ্ঞান মানব সমাজের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের নিয়মকে ব্যাখ্যা করে। সমাজবিজ্ঞানকে বাদ রেখে বিজ্ঞান চর্চা হয় না কারণ মানব সমাজেই প্রকৃতি বিজ্ঞানের সৃষ্টি ও বিকাশ হয়ে চলেছে। প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চার বিকাশ মানব সমাজের বিকাশের সাথে উতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

বর্তমান দুনিয়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে ও বিকাশের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তদসত্ত্বেও, মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে বলপূর্বক আহ্বান করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জোর করে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে ধর্মবাদ, জাত-পাত, অলৌকিকবাদ, বর্ণবাদ, লিঙ্গবাদ ইত্যাদি যার প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই নাকচ করেছে। মানুষের জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমে তার অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে সন্তর্পণে। সুকৌশলে সমাজ জীবনের সঙ্গে ধর্মের অভিযোজন ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস রাখা হচ্ছে। ধর্মকে বিজ্ঞানের মোড়কে চালানো হচ্ছে, পুরাণকে ইতিহাস বলে দেখানো হচ্ছে। আর এসবই করা হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে, রাষ্ট্রের মাইনেভোগী বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে। বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থার কারণে সমাজজীবনে মানুষের অনিশ্চয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে চটজলদি পরিত্রাণ পাবার পথ দেখাতে অবিজ্ঞান, ছদ্মবিজ্ঞান, ব্ল্যাকম্যাজিক, জাদুটোনা ইত্যাদি আমদানি করা হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। এই পরিস্থিতিতে শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতির ঘৃণ্য উদ্দেশ্যকে মানুষের কাছে উপস্থাপিত না করে মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে যাওয়া ভস্মে ঘি ঢালার সমতুল্য। তাই বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞান আন্দোলনকে রাজনীতিমুক্ত রাখার তত্ত্ব শাসকগোষ্ঠীর তত্ত্বকেই সমর্থন করে। বিজ্ঞানমনস্কতা ও রাজনৈতিক সচেতনতা কেবলমাত্র একে অন্যের পরিপূরকই নয়, সমার্থকও বটে।■

এ আঁধার ঘুচবে কবে?

সাম্প্রতিক কেরালার ইলানথুর জেলায় ও পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার দুটি নরবলির ঘটনা মানব সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। খবরে প্রকাশ, দুটি ক্ষেত্রেই তন্ত্রসাধনার প্রমাণ মিলেছে। কেরালার ঘটনায়, নরবলি দিলে নিজের অর্থাভাব থেকে মুক্তি পাবে ও সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে এমন ধারণা থেকেই তা করা হয়েছে বলে তন্ত্রসাধিকা জানিয়েছেন। যেহেতু, তন্ত্রসাধনা ও নরবলির ঘটনা মাঝেমধ্যে খবরের শিরোনামে চলে আসতে দেখা যায় তাই স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। কেরালার মতো রাজ্যে যেখানে সরকারী হিসাবে সাক্ষরতার হার ৯৬.২ শতাংশ সেখানে এই বর্বরোচিত কুসংস্কার এখনও টিকে আছে কিভাবে? এগুলি কি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরামহীন অগ্রগতি সত্ত্বেও মানব মনে এই নারকীয় প্রবৃত্তি টিকে থাকার কারণ কী? প্রথাগত বিজ্ঞান শিক্ষা কি মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করে তোলে?

প্রাগৈতিহাসিক যুগে, প্রকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্ক জানা না থাকায় মানবমনে বিভিন্ন অলৌকিক ধারণার জন্ম হয়। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড়, তুষারপাত, মহামারি ইত্যাদিকে রুষ্ট দেবতার প্রকোপ বলে এক সময় মনে করা হত ও এর থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বলিদান (নরবলি বা পশুবলি) করে তাকে তুষ্ট করার বিধান দেওয়া হত। তথাকথিত অলৌকিক শক্তিকে (দেব-দেবীকে) তুষ্ট করে স্বার্থ সিদ্ধ করার উপায় হিসাবে তথাকথিত আধ্যাত্মিক সিদ্ধ পুরুষদের মন্ত্রশক্তি রূপে ম্যাজিকের আবির্ভাব হয়। এরই পথ ধরে ব্ল্যাক ম্যাজিক, তন্ত্রসাধনা, ডাইনীবিদ্যা ইত্যাদির জন্ম হয়। দেব-দেবীর পূজার্চনায় পশুবলির প্রচলন এখনো রয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নরবলির ঘটনাগুলি সেই ধারাবাহিকতারই ফসল।

বর্তমানে, বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্কগুলিকে বহুলাংশে সমাধান করতে সক্ষম হলেও, প্রথাগত শিক্ষায় সাধারণ মানুষের কাছে তা অধরা থাকছে। প্রথাগত শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের এক বড় অংশ কুসংস্কার, অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক। কেবলমাত্র প্রথাগত শিক্ষা মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে পারে না। বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অনেকে যেন তেন প্রকারেন এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছেন। সমস্যা সমাধানের সঠিক দিশার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে অরাজকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সমান তালে। নিজেকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে এই অন্ধকার দীর্ঘায়িত করতে রাষ্ট্র অবতীর্ণ হয়েছে প্রধান ভূমিকায়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমস্ত প্রচার মাধ্যমে কুসংস্কার, অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান, তুকতাক ইত্যাদির প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে অবিরত। তাই, স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান ও অলৌকিক বিষয়গুলি চিহ্নিত করে তা বাতিল করতে হবে ও কুসংস্কার বিরোধী শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করার দাবিকে সোচ্চার করতে হবে। এই কাজে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে।■

কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা ঃ

সি. এস. আই. আর-এর বিজ্ঞানীদের নব নির্মিত রামমন্দির পরিদর্শন

কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) এর বিজ্ঞানীরা ব্যক্তি হিসেবে নয় একটি সরকারি বৈজ্ঞানিক সংস্থার তরফে অযোধ্যায় নবনির্মিত রাম মন্দিরে গেছিলেন সম্প্রতি। তারপর তাঁরা ২১শে নভেম্বর২০২২, সংস্থার তরফ থেকে টুইট করে জানান যে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে রাম নবমীর দিন অযোধ্যায় নবনির্মিত রামমন্দিরে কীভাবে দিনের প্রথম সূর্যরশ্মি পূজ্য দেবতা 'রামলালা'র মাথায় এসে পড়বে, তার বিশ্লেষণের জন্যই এই অভিযান। বিজ্ঞানীরা নাকি বিষয়টি হাতে কলমে বুঝিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষকে। এই পোস্টে প্রধানমন্ত্রী দফতর সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরকে ট্যাগ করা হয়েছে। একটি টিভি চ্যানেলের ভিডিও ফুটেজেও বিষয়টি দেখা গেছে।

রাষ্ট্রশক্তি যতই এই ঘটনাকে একটি সাধারণ পরিদর্শন হিসাবে দেখাতে চাক, এই ঘটনা কতগুলি প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে। প্রথমতঃ এটা কিছু ব্যক্তির (তারা বিজ্ঞানী হলেও) ব্যক্তিগত পরিদর্শন নয়। সরকারি সংস্থার এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য কী তা স্পষ্টভাবে বলা হোক। দ্বিতীয়তঃ ঘটনাটিকে টুইট করে প্রচারের আলোর সামনে আনার উদ্দেশ্য কি? এটা কি বিজ্ঞানীদের কাজ? এখানে বিজ্ঞানীরা নয়, এই সরকারি বিজ্ঞান সংস্থা যেভাবে অলৌকিক বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতে চতুর পদক্ষেপ নিয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ■

ভারত লোকতন্ত্রের জননী ?

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারপার্সন এম. জগদীশ কুমার ৪৫টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ৪৫টি ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ১৫-৩০শে নভেম্বর, ২০২২ পর্যায়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন 'ভারত ঃ লোকতন্ত্রের জননী' শিরোনামে সংবিধান দিবস পালনে বক্তৃতামালার আয়োজন করে। এই নির্দেশের ভিত্তিতে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলর ও কলেজের প্রিন্সিপালদের উদ্দেশ্যে মঞ্জুরি কমিশনের সেক্রেটারি প্রফেসর রজনীশ জৈন ১৫ই নভেম্বর ২০২২ একটি চিঠি পাঠান। সেখানে লেখা ছিল – ... 'There are ample pieces of evidence, right from the Vedic period, that emphasises the democratic traditions of India.'

অর্থাৎ বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ আছে যা ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করে।

প্রাচীন ভারতে লোকতন্ত্র বলতে স্পষ্টতই বৈদিক যুগ থেকে শুরু বলা হয়েছে। প্রথম বেদ, ঋকবেদের রচনাকাল ঐতিহাসিকদের মতামত অনুসারে ১৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বক্তব্য অনুসারে লোকতন্ত্র বা ডেমোক্রেসি ধারণার আগমন ইউরোপে নয়, ভারতেই প্রথম হয়েছিল এবং সমগ্র পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখন্ডে যখন আদিম সাম্যবাদী সমাজ বা দাস সমাজ চলছে সেই সময়। এই বক্তব্যের সমর্থনে কি যুক্তি আছে?

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এই বক্তব্যের সমর্থনে যে যুক্তি পাওয়া গেছে, তা পাওয়া গেছে 'ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ'-এর রচনায়। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে বৈদিক যুগ থেকেই জনবাদ (লোকতন্ত্র) এবং রাজ্য – দুই ধরনের ব্যবস্থা ছিল ভারতে। এক ধরনের 'ভারতীয় অভিজ্ঞতা' তৈরি হয়েছিল গ্রামীণ স্তরে এবং কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাতে। এটাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের যুক্তি।

১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকে ক্রমান্বয়ে ভারতে যে বর্ণাশ্রম প্রথা শ্রেণীবিভাজনের আকারে আগমন ঘটেছিল, তা হল 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র' এই চতুর্বর্ণের বিভাজন। এছাড়া শুদ্রেরও নিচেও অন্তজ শ্রেণীর খোঁজ পাওয়া গেছে পেশার ভিত্তিতে। এই বিদ্যমান অর্থনৈতিক-সামাজিক বর্গগুলি দেখে কখনোই বলা যায় না যে এই সময় থেকে ভারতে পুঁজিতন্ত্রের উৎসগুলি দেখা গেছিল। আর ইউরোপের ইতিহাস (অর্থনৈতিক ও সামাজিক) বিতর্কের কোনো অবকাশ না রেখে এটা প্রতিষ্ঠা করেছে যে লোকতন্ত্রের মত শব্দের উৎপত্তির ভিত্তি পুঁজিবাদ। ভারতে বৈদিক যুগ পরবর্তী পর্যায়ে এমন অবস্থা সমাজ বিজ্ঞানের কোন ছাত্র কল্পনাও করতে পারে না।

পুঁজিবাদী যুগ যে শব্দ 'লোকতন্ত্র'-এর জন্ম দিয়েছিল সেই ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীকে পেট ভরা খাবার, সুস্থ বাসস্থান, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুযোগ ও অন্যান্য প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। তাই অধিকাংশ শ্রমজীবীর লোকতন্ত্র হল শ্রমজীবীদের সমাজতন্ত্র। এই লোকতন্ত্র তো নয়, এমনকি পুঁজিবাদী ধারণায় লোকতন্ত্রও ইতিহাসের বিজ্ঞান অনুসারে বৈদিক যুগে ভারতে আসে নি। তাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এই নির্দেশ সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও মিথ্যা। ■

চয়ন ঃ

প্রতিদিনের জীবনে জেমস ওয়েবের প্রযুক্তি

মহাকাশ, জীবপদার্থবিজ্ঞান কিংবা মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য – আগামী কয়েক দশকে আমূলে বদলে যাবে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের হাত ধরে। তবে শুধু মহাকাশ বা মহাবিশ্বই নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বড়সড় প্রভাব ফেলবে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

মহাবিশ্বের প্রথম আলোর খোঁজে নেমেছেন বিজ্ঞানীরা। মহাজাগতিক এই গোয়েন্দারা জানতে চান, কেমন ছিল শিশু মহাবিশ্ব। কিন্তু সুদূর অতীতের সেই শিশু মহাবিশ্বের গল্প জানার উপায় কী? উত্তর, আলো – মহাজাগতিক গুরূত্বপূর্ণ সব তথ্যের বাহক। ১ হাজার ৩০০ কোটি বছর অতীত মহাবিশ্বের গল্প শুনতে হলে ধরতে হবে সেই সময়ের আলো। খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে তাকে।

বিজ্ঞানীরা উঠেপড়ে লাগলেন। ১০ বিলিয়ন, মানে ১ হাজার কোটি ডলার খরচ করে বানানো হলো নতুন সব প্রযুক্তি। নির্মিত হলো হাবলের উত্তরসূরি জেমস ওয়েব নভোদুরবিন।

সবই ঠিক আছে। কিন্তু পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ এসব মহাজাগতিক, দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর নিয়ে চিন্তিত নন। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। বুড়ো বয়সে অসুখ করলে চিকিৎসার সাধ্য নেই। দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী।

মাটির এই পৃথিবীতে বসে বিজ্ঞানীদের এসব কাজকারবার তাই অনেকের কাছে বিলাসিতা। তাঁদের প্রশ্ন, এসবে আমাদের লাভটা কী? শিশু মহাবিশ্বের ছবি আমাদের কী কাজে লাগবে? জেমস ওয়েব নভোদুরবিন কি আমাদের উন্নত চিকিৎসার পথ দেখাবে?

১২ জুলাই জেমস ওয়েব নভোদুরবিনের প্রথম ছবি প্রকাশের পর এ রকম নানা প্রশ্ন ঘুরছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। শুনে কেউ কেউ বিরক্ত হন। কেউ আবার একাত্ম হন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে।

শুনতে যেমনই শোনাক, এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানীরাও সেটি জানেন। তাঁরা বোঝেন, শুধু জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়। ব্যবহারিক প্রয়োগও থাকতে হবে জেমস ওয়েবের প্রযুক্তিগুলোর। তা আছেও। সেসব প্রয়োগ নিয়ে কথা বলার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার করি। জেমস ওয়েবের হাত ধরে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময় নয়। সবাই একে বলছেন ইঞ্জিনিয়ারিং মারভেল। অর্থাৎ প্রকৌশল বিস্ময়।

১ হাজার ৩০০ কোটি বছরের অতীত মহাবিশ্বের ছবি তোলার জন্য বিস্ময়কর সব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হয়েছে প্রকৌশলীদের। ১ হাজার কোটি ডলারের বেশির ভাগ গেছে এসব উদ্ভাবনের পেছনে। এর সব কটি নিয়ে এ ছোট্ট লেখায় কথা বলা সম্ভব নয়। তাই গুরুত্বপূর্ণ দু-একটি উদ্ভাবন নিয়ে আলোচনা করব।

দুই

জেমস ওয়েবের মূল আয়না ১৮টি ছোট আয়নার সমন্বয়ে বানানো। প্রয়োজনে ভাঁজ করা যায়। সে জন্য এটি বানানোর সময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য পরিমাপ পদ্ধতিতে অনেক উন্নতি করতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের। এ ক্ষেত্রে তাঁরা কাজ করেছেন 'ওয়েভফ্রন্ট সেন্সিং অ্যান্ড কন্ট্রোল' প্রযুক্তি নিয়ে।

এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জেমস ওয়েব এল ২-তে পৌঁছানোর পর ১৮টি ছোট আয়নাকে সঠিকভাবে ভাঁজ খুলে, নির্দিষ্ট অবস্থানে নিয়ে গিয়ে সব কটি মিলে একটি প্রতিফলক তল বা আয়না তৈরী করা হয়েছে। শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এ কাজের জন্য প্রয়োজন নিখুঁত পরিমাপ। এ জন্য যে নতুন ধরনের পরিমাপযন্ত্র বানানো হয়েছে, তার নাম 'স্ক্যানিং শেক-হার্টম্যান সেন্সর'।

বিভিন্ন সার্জারি, চোখের চিকিৎসা সহ নতুন রোগ শনাক্ত করার কাজে লাগবে এ যন্ত্র। চোখের ব্যাপারে যেসব তথ্য জানতে ঘন্টা পেরিয়ে যেত সার্জারি বা বড় কোনো অসুখ হলে, সেগুলো এখন এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জানা সম্ভব কয়েক সেকেন্ডে। এটি ইতিমধ্যে ব্যবহারিক কাজে লাগানোর জন্য অ্যাবট মেডিকেল অপটিকস ইনক কাজ শুরু করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে এর মাধ্যমে চোখের চিকিৎসা অনেক উন্নত হয়ে উঠবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন উদ্ভাবনের নাম 'লেজার

ইনফেরোমিটার'। এটি এক ধরনের হাইস্পিড অপটিক্যাল সেন্সর।

জেমস ওয়েবের একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এর আয়না ও যন্ত্রপাতি তীব্র শীতল অবস্থায় রাখা। তীব্র মানে তীব্র, – ৪৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। অর্থাৎ প্রায় ৫ কেলভিন বা - ২৬৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। নিখুঁত ছবি তোলার জন্য আয়না ও যন্ত্রগুলোকে এ তাপমাত্রায় রাখা জরুরি। কারণ, জেমস ওয়েব খুব কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের, ন্যানোমিটার স্কেলে ছবি তুলবে। এ তাপমাত্রায় না রাখলে যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যকার অণু সামান্য তাপে, অতি সামান্য পরিমাণ হলেও কাঁপবে। এই কম্পন বা ভাইব্রেশন সমস্যা করবে ছবিতে। সমস্যা মানে নয়েজ, অর্থাৎ বাড়তি, অযথা তথ্য ঢুকে যাবে মূল তথ্যগুলোর সঙ্গে।

সেটা যেন না হয়, তাই ৪ ডি টেকনোলজি করপোরেশন বেশ কয়েক ধরনের নতুন হাইস্পিড লেজার ইনফেরোমিটার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। সহজ করে বললে, এর কাজ হলো লেজার ব্যবহার করে সব ধরনের কম্পন থামিয়ে দেওয়া। এই প্রযুক্তি সেমিকন্ডাক্টর, বিমান বা রকেট পরিচালনা থেকে শুরু করে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণায় কাজে লাগবে। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতে কোয়ান্টাম কম্পিউটার বা আরও উন্নত সুপার কম্পিউটার বানানো হলে, সে ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে এসব প্রযুক্তি। কারণ, এ ধরনের প্রযুক্তিগুলো থেকে যে পরিমাণ তাপ বেরিয়ে আসে, তা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজন উন্নত মানের শীতক। এ তো ভবিষ্যতের কথা। ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলারের শিল্প গড়ে উঠেছে এই প্রযুক্তি ঘিরে। শিগগিরই আরও অনেক মানুষের কর্মসংস্থান করবে এই প্রযুক্তি।

এবার একটা মজার বিষয় বলি। জেমস ওয়েবের জন্য আরেকটি চমৎকার প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে। ক্রায়োজেনিক অ্যাপ্লিকেশন-স্পেসিফিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস। সহজ করে বললে এটাকে বলা যায়, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির একটি প্যাকেট। একটি সম্পূর্ণ সার্কিট বোর্ডে থাকা নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ছোট এই প্যাকেটে এমনভাবে বসানো হয়েছে, যেন এটি দিয়েই সংশ্লিষ্ট সব কাজ করা যায়। কাজটা কী? নিয়ার-আইআর ডিটেক্টর থেকে পাওয়া অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করার জন্য এটি ব্যবহার করছে বিজ্ঞানীরা। খুবই কম তাপমাত্রায় যেন কাজ করতে পারে, সেভাবেই যন্ত্রটি উন্নত করে ডিজাইন করা হয়েছে।

জেমস ওয়েবকে বিজ্ঞানীরা বলছেন হাবলের উত্তরসূরি। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়েব আরেকবার এ কথার যথার্থতা প্রমাণ করল। কারণ, প্রযুক্তিটি ওয়েবের জন্য বানানো হলেও বর্তমানে এটি হাবল নভোদুরবিনেও ব্যবহার করা হচ্ছে। উন্নত করার ফলে বর্তমানে ক্রায়োজেনিক অ্যাপ্লিকেশন-স্পেসিফিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস প্রোগ্রামেবল। অর্থাৎ দরকার মতো একে প্রোগ্রাম করে দিয়ে ক্যামেরা থেকে পাওয়া সিগন্যাল প্রসেস করা, নয়েজ দূর করা সহ সিগন্যালে কোনো সমস্যা হলে কোড লিখে সেগুলো অনেকটা দূর করা সম্ভব। ৩০ বছর ধরে কাজ চালিয়ে যাওয়া হাবলের জন্য একে বলা চলে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি।

এছাড়া ওয়েবের জন্য যে নিয়ার-ইনফ্রারেড ডিটেক্টর বানানো হয়েছে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনেক মহাকাশ মিশনে এটি কাজে লাগবে।

এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলে রাখা প্রয়োজন। এক, আগেই বলেছিল, জেমস ওয়েব এক প্রকৌশল বিস্ময়। এর জন্য এ রকম আরও অনেক প্রযুক্তি উদ্ভাবন বা উন্নত করেছেন বিজ্ঞানীরা। এর সব কটির ব্যবহার বর্তমানে নেই। কারণ, ওই রকম যন্ত্রই পৃথিবীতে ব্যবহৃত হচ্ছে না এখনো। কিন্তু ভবিষ্যতে এসব প্রযুক্তি আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগবে, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

এটার একটা ভালো উদাহরণ অ্যাপোলো মিশন। সেই ১৯৬৯ সালে চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য নাসা যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছিল, আজ সেগুলো আমাদের প্রতিদিনের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্যাটেলাইট, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট থেকে শুরু করে বাসায় ডিমভাজির জন্য ব্যবহৃত নন-স্টিক ফ্রাই প্যানসহ নানা কিছু আমরা পেয়েছি মূলত সেই অ্যাপোলো মিশনের হাত ধরে। সেই মিশন সফল করার জন্য এসব প্রযুক্তির উদ্ভাবন। জেমস ওয়েবের জন্য আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি কী কী কাজে লাগবে, এর সব আমরা এখনো জানি না। কিন্তু কাজে লাগবে, এটা বোঝার জন্য রকেট বিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, জেমস ওয়েব নির্মাণ বলি বা বিভিন্ন মহাকাশ মিশন কিংবা বৈজ্ঞানিক কোনো বড় মিশন – এগুলো প্রতিটিই মিলিয়ন থেকে বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি। অনেক প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে নানা পেশার মানুষ এসব প্রজেক্টে কাজ করেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বা ইউরোপের যেসব দেশ এসব প্রজেক্ট হাতে নেয়, বিভিন্ন দেশের মেধাবী মানুষ সেসব দেশে গিয়ে প্রজেক্টে যোগ দেন। তাঁদের কর্মসংস্থান হয়। অর্থাৎ যেভাবেই ভাবি না কেন, প্রযুক্তিগত দিক ছাড়াও অর্থনৈতিকভাবে এই প্রজেক্টগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

এটি হলো জেমস ওয়েবের প্রযুক্তিগুলোর প্রায়োগিক দিক।

➔

কালজয়ী বিজ্ঞানী স্মরণে ঃ

মারি কুরি – এক নিঃশব্দ বিপ্লব

– ঝুমা সমাদ্দার

যাঁর গবেষণার জন্য বিজ্ঞানজগৎ আজও আভূমি নত হয়ে কুর্ণিশ জানায়, তিনি মারি কুরি। যে সময়কার সমাজে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা একরকম গর্হিত অপরাধ, সে সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি বিষয়ে দুটি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

তিনি আসলে এক নিঃশব্দ বিপ্লবের পথপ্রদর্শক। সমস্ত রকম সামাজিক, আর্থিক, শারীরিক বাধা অতিক্রম করে সাফল্যের শিখরে পৌঁছানোর এক জ্বলন্ত প্রতীক তিনি। কট্টর পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর বিদ্রোহ ঘোষণার প্রতিভূ। আর্থিক অনটনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছানোর নিদর্শন।

তিনি জন্মেছিলেন ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর পোল্যান্ডের ওয়ারশ শহরে। বাবা তাঁর শিক্ষক। মা'ও ছিলেন শিক্ষিকা, যাঁকে মারি জন্মাইস্তক অসুস্থই দেখে এসেছে। মারি'র বইয়ের প্রতি অসম্ভব আকর্ষণ ছোটোবেলা থেকেই। স্নেহশীলা মা ছোটো মেয়েটিকে বইপোকা হওয়া থেকে আটকানোর জন্য জোর করেই বাইরে খেলতে পাঠাতেন।

হঠাৎই চাকরি হারিয়ে তিন মেয়ে, এক ছেলে এবং অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে অভাবের সংসারে অসহায় হয়ে পড়লেন মারি'র পন্ডিত পিতা। অবশেষে বাড়িটিকে বোর্ডিং বানিয়ে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রদের বাড়িতে রেখে রোজগারের চেষ্টা আরম্ভ করেন। তাঁদের দরিদ্র সংসারে আর যা-ই থাক, বিদ্যা এবং শিক্ষার অভাব কোনোদিন ছিল না। সন্তানেরা সকলেই মেধাবী, সুশিক্ষিত। কিন্তু রাশিয়ার জার শাসিত পোলিশ

➔

●*প্রতিদিনের জীবনে জেমস ওয়েবের প্রযুক্তি*

কিন্তু এ ছাড়া আরও দুটি বড় ভূমিকা রাখে ওয়েব, হাবল বা এ ধরনের বৈজ্ঞানিক মিশনগুলো।

একটি ভূমিকা বুদ্ধিবৃত্তিক। সভ্যতার শুরুর আগে থেকে মানুষ জানতে চেয়েছে, আমরা কোত্থেকে এলাম? কোথায় যাচ্ছি? মহাবিশ্বের মাঝে আমাদের অবস্থান কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা মানুষকে তাড়িত করেছে, আজও করছে। পড়াশোনা শেখা, নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে ফেরা আমাদের জন্য তাই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা শুধু মানুষের জীবন সহজ করার কাজ করে না, এটি মানুষকে নিজের বিষয়ে মৌলিক এসব প্রশ্ন জানার যে তাড়না, তা-ও খানিকটা প্রশমিত করে।

বুদ্ধিবৃত্তিক এই তাড়না আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। মানুষ হিসেবে আপনি যদি না-ই জানেন আপনি কে, কোথা থেকে এলেন, আপনার জীবনযাপনের উদ্দেশ্য কী, তাহলে বেঁচে থাকার কি কোনো অর্থ হয়?

দ্বিতীয় বিষয়টি বিনয়ী ও দায়িত্ববান হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজেদের ক্ষুদ্রতা অনুভব করি আমরা। অথচ একসময় মানুষ ভাবত, মহাবিশ্বের সবকিছু তাকে ঘিরেই ঘুরছে। রাজারা মনে করতেন, তাঁরা দেবতার প্রতিনিধি। আজ থেকে ১০০ বছর আগেও মানুষ ভাবত, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির বাইরে কিছু নেই। কিন্তু এখন আমরা জানি, মহাবিশ্বের কোটি কোটি গ্যালাক্সির একটি এই মিল্কিওয়ে। এটা আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্রতা বুঝতে শেখায়, ভালো মানুষ হতে শেখায়। আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, পৃথিবীর সব মানুষ সমান এবং মহাবিশ্বের বিশালতায় আমাদের পৃথিবী একটি নীল বিন্দু ছাড়া কিছুই নয়।

এটা আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেখায়। একটাই পৃথিবী আমাদের। প্রাণধারণের উপযোগী এই একটি গ্রহ ছাড়া আর কোথাও প্রাণের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি আজও। তাই এই গ্রহের যত্ন নিতে হবে আমাদের। নিজেদের জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। ■

লেখক ঃ সম্পাদনা দলের সদস্য, বিজ্ঞানচিন্তা

সূত্র ঃ নাসা, ইসা, ওয়েব টেলিস্কোপ ডট ওআরজি

মেয়েদের নিজের মাতৃভাষাও বলতে হত গোপনে। ইন্সপেক্টরের সামনে ফরাসি ভাষা বলে বাহাদুরি পেলেও মাতৃভাষার অপমানে মারি'র চোখে জল আসত। মারি ও তাঁর দিদি রনিও ঠিক করেছিলেন, তাঁরা প্যারিস যাবেন এবং প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করে মাতৃভূমির সম্মান বৃদ্ধি করবেন।

কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর এক বোন মারা গেল টাইফয়েডে। মা চলে গেলেন যক্ষ্মা রোগে। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পরে অষ্টাদশীর মারি'কে ওয়ারশ ছেড়ে যেতে হল গভর্নেসের কাজ করে নিজে পড়াশোনা জারী রাখতে। দিনে মালিকের বাড়ির মেয়েদের পড়ানো, রাতে নিজের পড়াশোনা।

গণিত ও পদার্থবিদ্যা তাঁর প্রিয় দুই বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করলেন প্যারিসে গিয়ে। অক্লান্ত পরিশ্রম আর অনশনে ততদিনে তাঁর শরীরের হাল বেশ খারাপ। হয়ত ফিরেই আসতেন ওয়ারশ শহরে। স্কুল শিক্ষিকার কাজেই বহাল হতেন হয়ত। কিন্তু, সে সময়ই তাঁর আলাপ হয় পিয়ের কুরি'র সঙ্গে। পিয়ের একজন অধ্যাপক। গবেষণা করেন চাপের প্রভাবে ক্রিস্টালের তড়িৎ উৎপাদন এবং চুম্বকত্বের ওপর উষ্ণতার প্রভাব নিয়ে। তাঁর প্রতিষ্ঠান বিরোধী চিন্তাভাবনার কারণে তিনি পিএইচডি'র পিছনে ছোটেননি। দুজনে মনপ্রাণ সমর্পণ করলেন বিজ্ঞানের একটি বিশেষ আবিষ্কারে।

জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেলম রন্টজেনের 'এক্স রে' আবিষ্কারের পরে ফরাসি বিজ্ঞান অঁরি বেকারেল পেয়েছেন অদ্ভুত এক খোঁজ। ইউরেনিয়াম মৌল আলো ছড়ায়। এই আলোর উৎস আবিষ্কার করলেন মারি। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭ কুরী দম্পতি ইউরেনিয়ামের আলো বিকিরণের নাম দিলেন **রেডিয়োঅ্যাক্টিভিটি**। ইউরেনিয়াম ছাড়াও তাঁরা পিচব্লেন্ড থেকে আবিষ্কার করলেন যে পদার্থ, তার নাম তাঁরা মাতৃভূমি পোল্যান্ডের নামানুসারে রাখলেন **পোলোনিয়াম** এবং তাঁদের আবিষ্কৃত আরও একটি মৌল, **রেডিয়াম**।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে রেডিয়োঅ্যাক্টিভিটি আবিষ্কার ও তার ব্যাখ্যার জন্য ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পেলেন তিনজন। **বেকারেল, পিয়ের** ও **মারি**। প্রথমে অবশ্য মারি'র নাম ছিল না নোবেল প্রাপকদের মধ্যে। পরবর্তীকালে পিয়েরের প্রতিবাদে মারি'র নাম সামিল করা হয়। তবে, পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে আহুত ছিলেন না মারি। মহিলাদের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ জাগানো ভালো কথা নয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে নোবেল কমিটির প্রেসিডেন্ট উদ্ধৃতি দিলেন বাইবেল থেকে। "ঈশ্বর বলছেন, পুরুষের একা থাকা ভাল নয়। আমি বানিয়ে দেব তার এক সাহায্যকারিণী।" অর্থাৎ এই সাফল্যে যেন মারির ভূমিকা ছিল পিয়েরের সাহায্যকারিণীর, তার বেশি নয়। পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে এ পুরস্কার ছিল তাঁর এক নিঃশব্দ বিপ্লব।

দ্বিতীয়বার **১৯১১** খ্রিস্টাব্দে তিনি মনোনীত হলেন রসায়নে নোবেল পুরস্কারের যোগ্য হিসাবে। রেডিয়াম ক্লোরাইড থেকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে রেডিয়াম মৌলের প্রস্তুত করা ও তার পারমাণবিক ওজন নির্ণয়ের জন্য এবার মারি কুরি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মাত্র ৮ বছরের ব্যবধানে দু-দুবার দুই আলাদা বিষয়ে নোবেল। এই অসামান্য অবদানের জন্য তাঁর তো মহাসমারোহে অভ্যর্থনা পাওয়ার কথা। কিন্তু সেবারও নোবেল কমিটি থেকে চিঠি এল, তিনি নোবেল পুরস্কার নিতে উপস্থিত না হলেই ভালো হয়। তাঁরা মারিকে নোবেল পুরস্কারের মঞ্চে আশা করছেন না।

ইতিমধ্যে পিয়েরের মৃত্যু ঘটেছে, যা নাড়া দিয়ে গেছে মারিকে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার। তিনি আরও ডুবিয়ে দিয়েছেন নিজেকে কাজে। তারই মধ্যে চিঠি লিখলেন নোবেল কমিটিতে, তিনি উপস্থিত থাকতে চান পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে। শত প্রতিকূল অবস্থাতেও আত্মসম্মানবোধ তাঁকে বার বার লড়াইয়ের ময়দানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আহত সৈন্যদের এক্স-রে করানো যেত না, ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তাঁদের আহত অঙ্গগুলি খোয়াতে হত। যুদ্ধাহত রোগীদের এক্স রে সঠিকভাবে করানোর অর্থ যোগাতে তিনি তহবিল সংগ্রহে নামেন। নিজের নোবেল বিক্রি করেও টাকা সংগ্রহ করেন। এসময় অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি ২২০টি রেডিওলজি স্টেশন গড়ে তোলেন। ফলে প্রায় ১০ লাখ যুদ্ধাহতের এক্স-রে ক'রে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল।

মারি কুরি দীর্ঘক্ষণ বিকিরণের সংস্পর্শে ক্ষতিকারক রক্তাল্পতায় ভুগছিলেন। অন্ধ হওয়ার পর, তিনি ৪ঠা জুলাই, ১৯৩৪ তারিখে ফ্রান্সের হাউতে-সাভোইয়ের পাসির কাছে সানসেলেমোজ ক্লিনিকে মারা যান।

যাঁকে প্রায় সমস্ত জীবনই অসাম্য, অপমান আর অভাবের সঙ্গে লড়তে হয়েছে, সেই তিনি কিন্তু আপোষ করেন নি কোথাও। অপরদিকে, তাঁর আবিষ্কার সমস্ত মানবজাতির কল্যাণসাধনের কাজেই লাগাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন তিনি। অথচ, তিনি বেশ জানতেন, তাঁর গবেষণা তাঁর নিজের শরীরের কতটা ক্ষতি করছে। মানবসমাজের উপকারে তাঁর এই আত্মোৎসর্গ মানুষ যেন আজীবন স্মরণ করেন। ■

ধারাবাহিক ঃ

মহাবিশ্বের বিস্ময় ঃ ব্ল্যাকহোল

মহাকাশ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা কতই না আশ্চর্য ঘটনার সম্মুখীন হন। তাঁদের কাছ থেকে যখন শুনি আমরাও তাজ্জব বনে যাই। কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল এমনই একটি বিষয় যা নিয়ে বিস্ময় ও কৌতুহল দু'টোই আমাদের চূড়ান্ত মাত্রায়।

ব্ল্যাকহোলের গ্র্যাভিটি (অভিকর্ষজ বল) এত বেশি যে – তার নিকটবর্তী সব কিছুকে নিজের দিকে টেনে নেয় – আর ফেরত দেয় না। এমনকি আলোক রশ্মিকেও তার গ্রাসে বন্দি করে। ব্ল্যাকহোল দেখা যায় না, সময় সেখানে থেমে যায়। আমাদের পরিচিত বিজ্ঞানের নিয়ম সেখানে ভেঙ্গে পড়ে। এমন বিষয় নিয়ে কার না কৌতুহল হয়! আর জানার আগ্রহও বেড়ে যায় বহুগুণে।

ব্ল্যাকহোল কোথায় থাকে?

আমাদের বাসভূমি – এই সুন্দর নীল-গ্রহ পৃথিবী। এছাড়াও আরও সাতটি গ্রহ আবর্তন করে চলছে সূর্যকে। সূর্য একটি মাঝারি মাপের তারা বা নক্ষত্র। এরকম ছোট-বড় প্রায় ১০০ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি) তারা আছে আমাদের গ্যালাক্সি 'মিল্কিওয়ে'তে। এরা সবাই আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারিদিকে অবিরাম ঘুরে চলেছে। কেন্দ্রে তাহলে শক্তিশালী এমন কী আছে? যে আছে সে হল একটি সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল "স্যাজিটেরিয়াস 'এ' স্টার"। এভাবে মহাবিশ্বে প্রায় ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে। প্রসারমান মহাবিশ্বে তারা পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের অনেকেরই কেন্দ্রে এক বা একাধিক (সাধারণত দুটি) সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল আছে – এটা বিজ্ঞানীদের অনুমান। ইতিমধ্যে অনেকগুলো ব্ল্যাকহোল আবিষ্কারও হয়েছে। সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল ছাড়াও অতি ক্ষুদ্র আকারের ব্ল্যাকহোলও আছে। বিভিন্ন প্রকৃতির ব্ল্যাকহোল রয়েছে – এদের প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব।

ব্ল্যাকহোলের ধারণার সূত্রপাত

এবার দেখা যাক ব্ল্যাকহোলের ধারণাটা কী করে এলো। এক্ষেত্রে নিউটনীয়ান ফিজিক্সের সাহায্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

ধরা যাক্ একটি টেনিস বলকে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বসে খাড়াভাবে উলম্ব দিকে ছুড়ে দেওয়া হল। বলটি আমার হাতে এসে পড়বে। বলটি আরো জোড়ে ছুড়লে অর্থাৎ বেশি বেগে ছুড়লেও এক সময় আবার হাতেই এসে পড়বে। কিন্তু বলটিকে কি এমন বেগে ছোড়া যাবে যে সেটি আর কখনোই পৃথিবী পৃষ্ঠে ফিরে আসবে না। অর্থাৎ বলটি চিরতরে পৃথিবীর গ্র্যাভিটির বাইরে চলে যাবে। হ্যাঁ সম্ভব। এক্ষেত্রে এই ন্যূনতম বেগ লাগবে প্রায় ১১.২ কিমিঃ/সেকেন্ড। এখানে বায়ুর ঘর্ষণজনিত বাধাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। একে বলে পৃথিবীতে বস্তুর মুক্তিবেগ (escape velocity)। অর্থাৎ আমরা বুঝলাম মুক্তিবেগ বা তার বেশি বেগে কোন বস্তুকে ছুড়লে সেটা গ্র্যাভিটি ফিল্ডের বা অভিকর্ষজ ক্ষেত্রের বাইরে চলে যায়, বস্তুটি কম ভর বা বেশি ভরের – যাই হোক না কেন। কিন্তু এই অভিকর্ষ ক্ষেত্র পৃথিবী পৃষ্ঠ আর অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ-কিংবা তারাদের ক্ষেত্রে এক রকম শক্তিশালী নয়। ভর যার যত বেশি তার অভিকর্ষ বল তত বেশি শক্তিশালী। এই বলকে অতিক্রম করে (যেমন টেনিস বলকে) চিরতরে মহাবিশ্বে বিলীন করে দিতে বেশি মুক্তিবেগ লাগবে। তাই আমাদের সৌরমন্ডলে সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির মুক্তিবেগ পৃথিবীর মুক্তিবেগের তুলনায় ৫ গুণের বেশি ৬০ কি.মিঃ/সেকেন্ড। আর সূর্যের মুক্তিবেগ আরও বেশি – ৬১৮ কিমিঃ/সেকেন্ড। সূর্যের থেকেও তো অনেক আরো বেশি ভরের তারা আছে। যদি এমন কোন তারা পাওয়া যায় যার মুক্তিবেগ আলোর বেগের থেকে বেশি – সেক্ষেত্রে আলো মুক্তিবেগ অর্জন করতে না পেরে ঐ নক্ষত্রের অভিকর্ষ ক্ষেত্র অতিক্রম করতে পারবে না। টেনিস বলের মত একসময় সর্বাধিক একটি উচ্চতায় পৌঁছে আবার নক্ষত্র পৃষ্ঠে ফিরে আসবে। তাহলে এই সর্বাধিক উচ্চতার দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্বে বসে ঐ নক্ষত্র থেকে কোন আলোই আসতে আমরা দেখব না। অর্থাৎ নক্ষত্রটি থেকে কোন আলো এসে আমাদের চোখের রেটিনায় পড়বে না। ফলে দর্শনের অনুভূতিই আমাদের তৈরি হবে না। এক কথায় নক্ষত্রটিকে দেখতে পাব না বা কালো দেখব। একে বলা হয়েছিল – 'ডার্ক স্টার'। স্বাভাবিকভাবে আলোর থেকে কম বেগের যেকোন বস্তু মুক্তিবেগ অর্জন করতে না পেরে ঐ নক্ষত্রটির অভিকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যেই চলা ফেরা সীমাবদ্ধ রাখবে।

ব্ল্যাকহোল নিয়ে এই প্রাচীন ধারণা নিউটনিয়ান ফিজিক্স থেকেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল। এমনকি কম ভরের বস্তু যদি ক্ষুদ্র পরিসরে নিয়ে আসা যায়, তাহলে অভিকর্ষ ক্ষেত্র এত শক্তিশালী হতে পারে যে সেখানে মুক্তিবেগ আলোর বেগকে হার মানিয়ে দেবে। অর্থাৎ ডার্ক স্টারের মত আচরণ করবে। পৃথিবীও একটা 'ডার্ক স্টার' হতে পারে যদি আপনি পৃথিবীটাকে চুপসে একটি মার্বেলের সাইজে নিয়ে আসতে পারেন। এসব আমরা নিউটনিয়ান ফিজিক্স থেকে গণনা (ক্যালকুলেশন) করতে পারি।

ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে নিউটনীয় ধারণার সীমাবদ্ধতা

একটি বিষয় লক্ষ্য করুন। নিউটনের আলোক কণা তত্ত্ব (করপাসকুলার থিয়োরি অফ লাইট) অনুসারে আলো হল ভরহীন বস্তুকণার প্রবাহ। যার ভর নেই তা অভিকর্ষ বল দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে বা তার চলার পথ বেঁকে, ঘুরে আবার ডার্ক স্টারের পৃষ্ঠতলে ফিরে আসতে পারে? এককথায় আলোর বেঁকে যাওয়ার ঘটনাটা নিউটনীয়ান ফিজিক্স কী করে ব্যাখ্যা করবে?

সময়ের অগ্রগতি ও ব্ল্যাকহোল সম্পর্কিত ধারণার বিকাশ

সময় এগোল। আলো নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতুহল বেড়ে চলল। আবিষ্কার হল আলোর তরঙ্গধর্ম। আলো একটি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, যা চলতে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। নির্ধারিত হল আলোর বেগ প্রায় ৩ লক্ষ কিমিঃ/সেকেন্ড যা শূন্য মাধ্যমে সর্বোচ্চ। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আলো কণার মতও আচরণ করে, যা ভরহীন ফোটন কণার স্রোত। ফলে আলোর দ্বৈত ধর্ম স্বীকৃতি পেল। কিন্তু ভরহীন আলোর গ্র্যাভিটির (অভিকর্ষ বলের) কারণে বেঁকে যাওয়ার ব্যাখ্যা মিলল না। 'ডার্কস্টার' কনসেপ্ট এখানে প্রশ্ন বিদ্ধ হল।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আইনস্টাইন প্রকাশ করলেন অপেক্ষবাদের বিশিষ্ট তত্ব (স্পেশাল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি) এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে অপেক্ষবাদের সাধারণ তত্ত্ব (জেনারেল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি)। গ্র্যাভিটি নিয়ে তিনি শোনালেন অন্য কথা। এটা কোন বল নয় – নিউটনের মহাকর্ষে যেমনটা ভাবা হত। স্থান-কাল বেঁকে গেলে বস্তু সেই বক্রপথ অনুসরণ করে। আর ভর বা শক্তি এই স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। আলোর বেঁকে যাওয়া এরই ফলশ্রুতি।

বিষয়টিকে বুঝতে হলে একটু বিষদে যেতেই হয়। স্থান কী? কাল কী? স্থানকালের সম্পর্ক কী? স্থান কাল বেঁকে যাওয়ার প্রভাব কীরূপ হয় ইত্যাদি।

স্থানের বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, আমরা দেখতে পাই না, ছুঁতে পারি না, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অস্তিত্বের ধারণা করতে পারি মাত্র। কিন্তু স্থানে বিভিন্ন বস্তুর উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই এবং আমরা নিজেরাও এই বস্তুরাশির এক একটি অংশ। ধরুন, আমরা একটি সরল রাস্তায় হেঁটে চলছি। অর্থাৎ স্থানে আমরা একটি দূরত্ব অতিক্রম করছি। পথটিকে সরল মনে হলেও পৃথিবী পৃষ্ঠ যেহেতু বক্র – গোলকাকার, তাই আমরা বক্রপথই অতিক্রম করছি। পথটি এখান থেকে যদি আমেরিকার ওয়াশিংটনে গিয়ে যুক্ত হয় তাহলে – এই পথটিকে আপনি একটি মানচিত্রে দেখলে সরল পথ দেখবেন; আর একটি গ্লোবে দেখলে বক্রাকার দেখবেন।

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক – একটি সমতল কাগজপৃষ্ঠে আপনি একটি সরলরেখা আঁকুন। এবার কাগজটিকে বাঁকিয়ে দিন দেখবেন যেভাবে কাগজের তলটিকে বাঁকিয়েছেন, সরল রেখাটিও সেভাবে বেঁকে গেছে। এবার উল্টোটা ভাবুন, ঐ বক্র কাগজের তলে আপনি যদি একটি সরলরেখা আঁকতে যান – আঁকতে পারবেন না; সেটা স্বাভাবিকভাবেই বেঁকে যাবে। অর্থাৎ সরলরেখাটি বক্র তলপৃষ্ঠের বক্রতা অনুসরণ করবে।

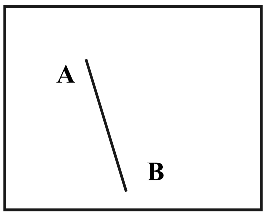

সমতল কাগজে আঁকা সরলরেখা ***A B***

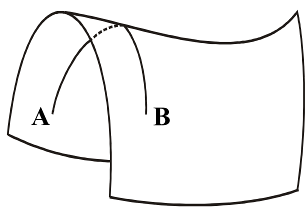

সমতল কাগজটিকে বাঁকিয়ে দেওয়ার পর ***A B*** *রেখা*

সমতলে একটি ত্রিভুজ আঁকলে আপনি তিনটি কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রী পান; কিন্তু গ্লোবের উপর (উত্তল পৃষ্ঠ) ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি পাবেন ১৮০ ডিগ্রীর বেশি। একটি অক্ষাংশ এবং ৯০ ডিগ্রী ব্যবধানে দুটি দ্রাঘিমাংশের অন্তর্বর্তী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আপনি পাবেন ২৭০ ডিগ্রী। আবার ঘোড়ার জিনের উপর ত্রিভুজের ক্ষেত্রে (অবতল পৃষ্ঠ) পাবেন ১৮০ ডিগ্রীর কম। সুতরাং বক্রতলের জ্যামিতির পরিমাপও অন্যরকম। স্থানে আমরা যে তল নিয়ে বললাম এটা দ্বিমাত্রিক তল (Two diamensional, সংক্ষেপে 2D তল)। কারণ এই তলের উপর আমরা ডানে-বামে এবং সামনে-পিছনে, এই দুটি দিকে বা মাত্রায় (2D তে) চলাফেরা করতে পারি। এবং দেখলাম তলের বক্রতা অনুসরণ করেই বস্তুর বিচরণ হচ্ছে এবং সেভাবেই

জ্যামিতিক পরিমাপ ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের সরলপথের বিচরণও তলের বক্রতার জন্য বক্র রূপ ধারণ করছে, অর্থাৎ বক্র হয়ে যাচ্ছে। ত্রিমাত্রিক স্থানেও আমরা দেখব বস্তুর স্বাভাবিক ও সহজতর বিচরণ বক্রপথ অনুসরণ করেই হয়। পূর্বের উদাহরণে ওয়াশিংটনে যদি আপনি আকাশ পথে যান তাহলে

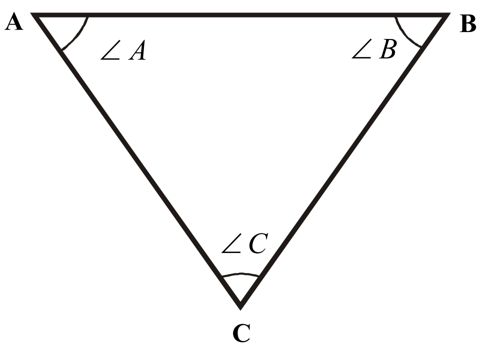

ত্রিভুজ ABC-র $\angle A + \angle B + \angle C = 180^0$

বামে, সামনে-পিছনে এবং উপর নিচে বিচরণ করতে পারি।

অতিসরলীকরণ করে স্থানে কোন বস্তুর বক্রতার সাহায্য নিয়ে আমরা স্থানের বক্রতা বৃদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করার একটা প্রয়াস রাখলাম মাত্র। তাই বলে কেউ যেন ভেবে না বসেন যে কোনো বস্তুর বক্রতা মানেই বস্তুটি যে স্থানে (স্পেসে) আছে –

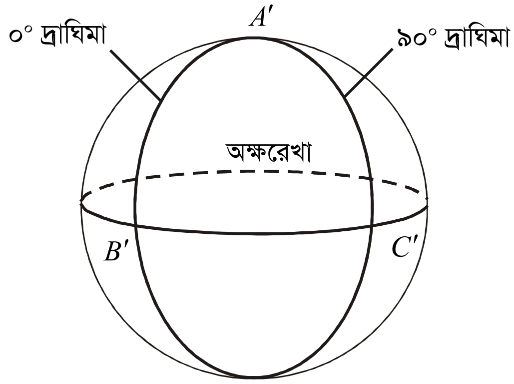

ত্রিভুজ $A'B'C'$ -র $\angle A' + \angle B' + \angle C' = 270^0$

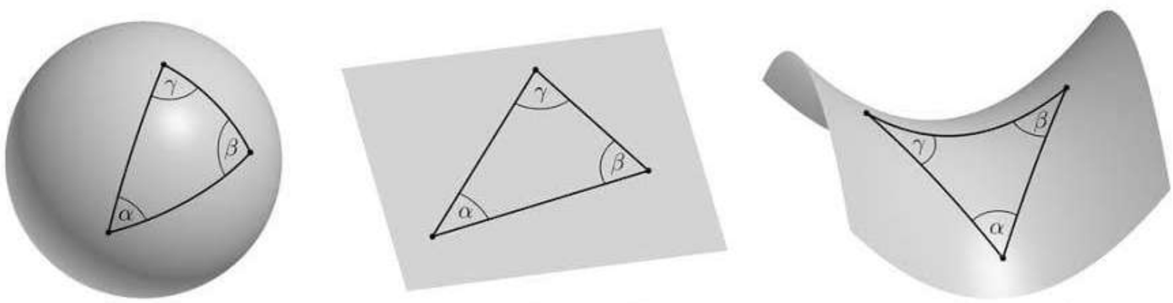

$\alpha + \beta + \gamma > 180°$ $\alpha + \beta + \gamma = 180°$ $\alpha + \beta + \gamma < 180°$

ফ্লাইট মোটামুটি পৃথিবীর বক্রপথই অনুসরণ করে। এখানে উচ্চতা নামক তৃতীয় মাত্রাটি যুক্ত হয় মাত্র, এজন্য ত্রিমাত্রিক (Three diamensional বা 3D)। ত্রিমাত্রিক স্থানে আমরা ডানে- তার বক্রতা। কারণ সমতলে যদি কোন বক্র রেখা আঁকা হয়, তার মানে তলটা বক্র হয়ে যায় না – তেমনি স্থানও (স্পেসও) বক্র হবে না। (ক্রমশ)

ঃ কৃষিমেলা ঃ

আগামী ২২শে জানুয়ারি,২০২৩ (রবিবার) বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার আমতা ইউনিটের পক্ষ থেকে কৃষিমেলা অনুষ্ঠিত হবে। হাওড়া জেলার কানুপুর গ্রামের মা মনসা ক্লাব প্রাঙ্গনে এই অনুষ্ঠান বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা অবধি চলবে।

ধারাবাহিক ঃ

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান

(তৃতীয় পর্ব)

বিশ্ব উষ্ণায়ন কি মানুষের সৃষ্টি? (দ্বিতীয় ভাগ)

বর্তমান পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা কি পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ?

আইপিসিসি, রাষ্ট্রসংঘ এবং বিভিন্ন পরিবেশবাদী এবং রাষ্ট্র দ্বারা ধারাবাহিক ও সংঘটিত প্রপাগান্ডায় শিক্ষিত সমাজের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করেন যে অস্বাভাবিক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে শিল্প বিপ্লবের পরে এবং বিশেষত বিগত ১৫০ বছরে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলকে আজ অবধি সর্বোচ্চ উষ্ণ করে তুলেছে। এর ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে সুউচ্চ পবর্তমালা এবং মেরু অঞ্চলের সব বরফ গলে সমুদ্রতলের যে বৃদ্ধি ঘটাবে তাতে পৃথিবীর অধিকাংশ মহাদেশের নিচু অংশ সমুদ্রের জলের তলায় চলে যাবে এবং ষষ্ঠবারের জন্য মানুষের কারণে অসংখ্য প্রজাতির গণবিলুপ্তি ঘটবে।

আংশিক বৈজ্ঞানিক ধারণার ভিত্তিকে একপেশেভাবে সবকিছু বিচার করলে আমরা অবশ্যই ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো। পৃথিবীকে স্থির, নিশ্চল, অপরিবর্তনশীল বস্তু হিসাবে বিবেচনা করলে এমন হওয়া স্বাভাবিক।

এটা ঘটনা যে শিল্প বিপ্লবের পরে, বিশেষত বিগত ১৫০ বছরে শিল্প, শিল্পোৎপাদনের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন এবং সভ্যতা বিকাশের প্রয়োজনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার অভূতপূর্ব হারে বেড়েছে। মনুষ্যজনিত কারণে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের নির্গমনের মাত্রা অতীতের তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ বেড়েছে। জ্বালানির দহন পরিবেশে দূষণের মাত্রা বাড়িয়েছে এটা একশভাগ সত্যি এবং এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু তা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু কেউই এ দাবি করছেন না যে এতে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা সমপরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

তাহলে কোন প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়? এটি হয় প্রধানতঃ তিনটি প্রক্রিয়ায় –

(১) কার্বন ডাই অক্সাইড জলে দ্রাব্য এবং তাই পৃথিবীর সমুদ্রে (এবং বড় জলাশয়) এর বড় অংশ দ্রবীভূত হয়ে কার্বনেটসহ নানা যৌগ গঠন করে। এই কার্বনেট, বাইকার্বনেট এবং অন্যান্য যৌগগুলি সমুদ্রের নিচে অধঃক্ষেপিত হয় সমুদ্রের জলের অম্ল-ক্ষার মাত্রার তারতম্যের ভিত্তিতে এবং চুনাপাথর সহ নানা যৌগ গঠন করে অথবা শামুক, ঝিনুক, প্রবাল ইত্যাদি অমেরুদন্ডী প্রাণীর বহিঃ আবরণ (outer shell) গঠন করে।

(২) বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডের একটা বড় অংশ জলে দ্রবীভূত হয়ে কার্বানিক অ্যাসিড গঠন করায় তা মহাদেশের ভূপৃষ্ঠের প্রস্তরে রাসায়নিক আবহবিকার (chemical weathering) ঘটায়। এই প্রক্রিয়ায় নানারূপের কার্বনজাত যৌগ এবং চুনাপাথরও সৃষ্টি হয়।

(৩) বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডের একটি অংশ উদ্ভিদজগতের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং উদ্ভিদে কার্বন যৌগগুলি সঞ্চিত হয়।

এছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মৃত্যুর পর পচন হওয়ার আগে যদি তা পলিতে জমা হয়ে আবহবিকার থেকে রক্ষা পায় তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের কার্বন যৌগগুলি জীবাশ্ম আকারে পাললিক শিলায় সঞ্চিত হয়।

এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক। অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা পৃথিবী সৃষ্টি থেকে আজ অবধি পৃথিবীর ইতিহাসে কি সর্বাধিক?

এটা অবশ্যই সঠিক যে পৃথিবীর সৃষ্টির শুরু থেকে বা জীবজগতের সৃষ্টির পরে এমনকি আধুনিক মানুষের সৃষ্টির কয়েক লক্ষ বছর পরে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড মাপার প্রযুক্তি বা যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে। তাই বর্তমান যুগের মত অতীতের তথ্য সরাসরি মিলবেনা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বিশেষত পুরাজলবায়ুবিদ (Palaeoclimatologists) রা অতীতকালের জলবায়ু অপ্রত্যক্ষরূপে জানার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। সাম্প্রতিকালে বিজ্ঞানের এই শাখার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। পুরাজলবায়ুবিদরা অতীতকালের বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা, কার্বন ডাই অক্সাইড, অক্সিজেন ইত্যাদির মাত্রা, সমুদ্রের জলতল ইত্যাদির হিসাব করেন আইস কোর (মাটির গভীর থেকে যন্ত্রের সাহায্যে কেটে তোলা বরফ), গাছের গুঁড়ি বা কান্ডের মধ্যকার বলয়গুলির আণুবিক্ষণীক পরীক্ষা, প্রবাল, প্রাচীন পরাগরেণু, বিভিন্ন পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির গবেষণা দ্বারা। এইসব প্রাকৃতিক প্রমাণের ভিত্তিতেই পৃথিবীর অতীত যুগের বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা, বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য যৌগের মাত্রা, সমুদ্রের জলতল ইত্যাদির পরিমাপ করা হয়। শুধু তাই নয়, এই গবেষণার দ্বারা পৃথিবীর জলবায়ু ও পরিবেশের আমূল পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব এবং বিলুপ্তির বিষয়ও জানা যায়।

পুরাজলবায়ুবিদদের গবেষণা থেকে প্রাচীন পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা, কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা, সমুদ্রের জলতল ইত্যাদি যা জানা গেছে এবং কখন, কোন অবস্থায় পৃথিবীতে প্রজাতির গণবিলুপ্তি ঘটেছে এখন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে একটি চার্টের মাধ্যমে। এই ইতিহাস চর্চার আগে বর্তমান পৃথিবী সম্পর্কে জানা `iKvi| eZ@gvb cw_exi Mo ZvcgvÎv 15° সেলসিয়াস, বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা ৪১৮ পিপিএম (প্রতি ১০ লক্ষে ৪১৮)

ফ্যানেরোযোয়িক (প্রথম অসংখ্য জীব প্রজাতির উদ্ভবের পর) যুগের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস

যুগ	বর্তমান সময় থেকে	গড় তাপমাত্রা (সেলসিয়াস°)	বায়ুমন্ডলে CO_2 মাত্রা পিপিএম (প্রতি দশ লক্ষে)	সমুদ্রের জলতল	প্রাণের উদ্ভব	গণবিলুপ্তি
প্লাইসটোসিন	২২ লক্ষ থেকে ১১, ৭০০ বছর আগে	৫	২০০	বর্তমান তেকে ৪০০ ফুট নিচে	আধুনিক মানুষ আগুন, পোষাক ব্যবহার করে এবং উষ্ণ অঞ্চলে অভিগমন করে রক্ষা পায়	শীতল যুগে পঞ্চম গণবিলুপ্তি
প্লায়োসিন	৩৫ লক্ষ থেকে ২২ লক্ষ বছর আগে	২৩	৪০০	–	হোমিনিড ও বিভিন্ন স্তন্যপায়ীর বিবর্তন	–
মায়োসিন	২.৩ কোটি থেকে ৫৩.৩ লক্ষ বছর আগে	১৭.৫-১৯.৫	৫৮০-৬৭০	–	–	–
অলিগোসিন	৩.৩৯-২.৩ কোটি বছর	২২-২৪	৫০০-৩০০০	–	–	–
ইওসিন	৫.৬-৩.৩৯ কোটি থেকে কোটি বছর আগে	৮	৫৬০	-	–	–
প্যালিওসিন	৬.৬-৫.৬ কোটি	২৪-২৫	৮৪০-২৫২০	–	নতুন করে অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ	–
ক্রিটেসিয়াস	১৪.৫-৬.৬ কোটি বছর আগে	৩৫	১০,০০০	বর্তমান থেকে ৩০০-৬০০ ফুট উঁচুতে এবং যুগের শেষে ৬০০-৭০০ ফুট উঁচুতে	–	বর্হিবিশ্ব থেকে প্রবল উল্কাপাতে চতুর্থ গণবিলুপ্তি
জুরাসিক	২০.১-১৪.৫ কোটি বছর আগে	২০-২৫	১৮০০	প্রথম পর্যায়ে বর্তমানের মত তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি	ডায়নোসর এবং বহু মেরুদন্ডী প্রাণীর বিকাশ	–
ট্রায়াসিক	২৫.২-২০.১ কোটি বছর আগে	৩২-৩৫ সর্বোচ্চ ৪০	প্রথমে ১২৬১-১৯৩৬ তারপর ১০৬৩-১৭৫৭	প্রথমে বর্তমানের মত তারপর ৩০-৬০ ফুট উঁচুতে	ডায়নোসর এর উদ্ভব (২৩.২ কোটি বছর আগে)	–
পারমিয়ান	২৯.৮৯-২৫.২ কোটি বছর আগে	১০-৩০	প্রথমে ৪২৬ এবং শেষে ২৫৫০	–	–	তৃতীয় তথা সবথেকে ভয়াবহ গণবিলুপ্তি ঘটে ভয়াবহ অগ্নুৎপাত ও বায়ুমন্ডলে মিথেনের বৃদ্ধির কারণে
কার্বনিফেরাস	৩৬-৩৩ কোটি বছর আগে	প্রথমে ২০ তারপর বিশ্ব শীতলায়নের জন্য কমে ১২	শুরুতে ১৫০০ তারপর ব্যাপক কমে ৩৪৪-৩১৩		–	–
ডেভোনিয়ান	৪১.৯২-৩৬ কোটি বছর আগে	প্রথমে ২২ তারপর কমে ১৯.৫	৪০০	–	মাছ, সন্ধিপদ প্রাণীর উদ্ভব	–
সিলুরিয়ান	৪৪.৩৮-৪১.৩৮ কোটি বছর আগে	–	৯০০	প্রথমে সমুদ্রতল উঁচুতে ছিল তারপর নেমে যায়	–	–
অর্ডোভিসিয়ান	৪৮.৩-৪৪.৩৮ কোটি বছর	প্রথমে ৪৪.৪, তারপর শীতলায়নের জন্য ব্যাপক হ্রাস হয় এবং পরে আবার বৃদ্ধি পায়	৩০০০-৯০০০ গড়ে ৫৬০০	প্রথমে উঁচুতে ছিল তারপর বর্তমানের তুলনায় ৬৬০ ফুট নিচে। পরে সমুদ্রতল উঠে আসে।	–	শীতলায়নের জন্য প্রথম গণবিলুপ্তি এবং সম্ভবত ২০ লক্ষ বছর পর উষ্ণায়নের জন্য দ্বিতীয় গণবিলুপ্তি
ক্যাম্ব্রিয়ান	৫৪.২-৪৮.৪ কোটি বছর আগে	২৫	৮৩৬০	বর্তমানের তুলনায় ১০০-২৯৫ ফুট উঁচুতে	অসংখ্য জৈব প্রজাতির উদ্ভব ঘটে যাকে ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ বলে	–

আমরা পৃথিবীর ফ্যানেরোজোয়িক যুগের ইতিহাস এখানে বর্ণনা করলাম কারণ এই যুগের শুরুতেই অসংখ্য প্রজাতির ব্যাপক উদ্ভব ঘটে।

ফ্যানেরোজোয়িক (অর্থাৎ বর্তমান যুগ থেকে ৫৪ কোটি ২০ লক্ষ বছর আগেকার) যুগের পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস থেকে কি জানা যাচ্ছে?

(১) প্রথমতঃ বর্তমান পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের রাজত্বকালে এবং শিল্প বিপ্লবের পর বায়ুমন্ডলের গড়তাপমাত্রা, বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা, পৃথিবীর সমুদ্রের জলতল কোনটাই পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ নয়।

(২) পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা, কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা অথবা সমুদ্রের জলতল কোনটাই সরলরৈখিক নিয়মে বাড়ে নি বা কমে নি। অসংখ্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সমষ্টিগত ফলাফল হিসাবে এর পরিবর্তন হয়েছে। মহাবিশ্বে বা আমাদের সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তনের কারণে মুখ্যত তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়, তবে সৌরকলঙ্ক, গ্রীণ হাউস এফেক্ট, প্লেট টেকটনিক প্রক্রিয়া, অস্বাভাবিকরূপের অগ্নুৎপাত এবং আরও নানা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সইডের মাত্রা ও সমুদ্রের জলতলের পরিবর্তন হয় মুখ্যত অগ্নুৎপাত এবং পৃথিবীর ভূ-আলোড়ণের (প্লেট টেকটনিক্স) ফলে।

(৩) ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় যে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড এর মাত্রা মনুষ্যজনিত কারণে (জ্বালানির দহনের ফলে) যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তার তুলনায় প্রাচীন অতীতে যখন পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভবই ঘটে নি অনেকগুণ বেশি ছিল, আবার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তার পরিমাণ কমেওছে।

(৪) বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের মাত্রা বেশি হওয়া মানেই বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বেশি হবে এমন কখনই নয়। বিগত ১৫০ বছরে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের মাত্রা ১০০ গুণ বাড়লেও বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বেড়েছে অতি সামান্য (৩৫০ পিপিএম থেকে ৪১৮ পিপিএম)। এর কারণ অসংখ্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডকে শোষণ করে।

(৫) বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বেশি থাকার মানেই পৃথিবী উষ্ণ হবে এমন ঘটনাও সত্যি নয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রার সঙ্গে উষ্ণতার সরলরৈখিক সম্পর্কও নেই। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্ত প্রক্রিয়া (প্লেট টেকটনিক্স এবং অগ্নুৎপাত)।

(৬) সমুদ্রের জলতল পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবার ওঠানামা করেছে এবং তা জীবকূলের গণবিলুপ্তির কখনওই মুখ্য কারণ হয়নি বরং এতে অধিকাংশ প্রজাতির বিকাশ ঘটেছে।

(৭) পৃথিবীতে আজ অবধি জীবের যে পাঁচটি গণবিলুপ্তি ঘটেছে তারমধ্যে দুটি গণবিলুপ্তি – প্রথম এবং সর্বশেষ ঘটেছে শীতলায়নের যুগে। একটি গণবিলুপ্তি প্রধানত বর্হিবিশ্বের উল্কাপাতের কারণে। একটি গণবিলুপ্তি সমুদ্রগর্ভে ব্যাপক অগ্নুৎপাতের কারণে ঘটেছে এবং সম্ভবতঃ একটি গণবিলুপ্তি উষ্ণায়নের কারণে ঘটেছে। সুতরাং বিশ্ব উষ্ণায়ন মানেই গণবিলুপ্তি নয়।

সুতরাং মনুষ্যসৃষ্ট বিশ্ব উষ্ণায়নের যে মডেল বর্তমানে ব্যাপক আকারে প্রচার করা হচ্ছে এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের নির্গমণের মাত্রার ভিত্তিতে পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিবর্তন ও সমুদ্রের জলতলবৃদ্ধির যে আতঙ্ক বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হচ্ছে সেই প্রপাগান্ডায় প্রভাবিত না হয়ে বিজ্ঞান মনস্কতার আলোকে পরিবেশের পরিবর্তনকে বিচার করা প্রয়োজন।

হিমবাহ এবং সুউচ্চ পর্বতের বরফের গলন এবং সমুদ্রের জলতলবৃদ্ধি – বৈজ্ঞানিক গবেষণা কি বলে?

ব্রিটিশ আবহাওবিদ, বিভিন্ন এনজিও সংস্থা, রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন এবং আইপিসিসি'র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে –

(১) ২০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের এক পঞ্চমাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রতটসহ পৃথিবীর নিচু অঞ্চলগুলি সমুদ্রের তলে চলে যাবে এবং কোটি কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হবেন।

(২) পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের ঘোড়ামারা দ্বীপ এবং অন্যান্য দ্বীপগুলি নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে।

(৩) ভারতের হিমবাহগুলি ২০৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গলে শেষ হয়ে যাবে। এতে প্রথমে হিমালয়জাত নদীগুলিতে জলবৃদ্ধি পাবে এবং তারপর সেগুলি বর্ষার পূর্বে শুকিয়ে যাবে।

(৪) এলনিনো, টর্নেডো এবং সমুদ্রের ঘূর্ণিঝড় বৃদ্ধি পাবে মহাদেশ ও সমুদ্রের উষ্ণতাবৃদ্ধির জন্য।

(৫) নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকা (আইপিসিসি যে এনজিও পরিচালিত পত্রিকার রচনার ভিত্তিতে মুখ্যত প্রচার করে) জানিয়েছে যে ২১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আন্টার্কটিকা ও গ্রীণল্যান্ডের বরফ গলে পৃথিবীতে সমুদ্রের জলতল ২০-৪০ মিটার বৃদ্ধি পাবে।

এর বিপরীতে বাস্তব চিত্র যা দেখা যাচ্ছে তা হল –

(১) গত তিন দশকে উপগ্রহ চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে ১০০০ বর্গ কি.মি জমি বেড়ে গেছে। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র নদীর বয়ে আনা পলি ঐ জমি তৈরি করেছে। বাংলাদেশে সরকারি মতে উপকূল অঞ্চলে বাঁধ দিলে আরও ৫০০০ বর্গ কি.মি জমি পাওয়া যেতে পারে।

(২) পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলের ঘোড়ামারা দ্বীপের ক্ষয়প্রাপ্তি নিয়ে গবেষণা করে নদী বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে এই দ্বীপের ক্ষয়প্রাপ্তি নদীর নিজস্ব গতিপথের পরিবর্তন এবং ভূমিতলের নিচে নামার (চ্যুতিজনিত Subsidence বা নেমে যাওয়া) কারণে। পার্শ্ববর্তী

নয়াচর দ্বীপের আয়তন বৃদ্ধি বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রের জলতলবৃদ্ধির তত্ত্বকে খারিজ করছে।

(৩) ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)র গবেষণা অনুসারে **বর্তমানে ভারতের হিমালয়ে হিমবাহের সংখ্যা ১৬,৬২৭। এর মধ্যে মাত্র ২৫টি হিমবাহের চরিত্র নিয়মিত নজরে রাখা হয় সরকারের সদিচ্ছা এবং অর্থ আনুকূল্যের অভাবে।**

আইপিসিসি-র প্রাক্তন অধিকর্তা রাজেন্দ্র পাচৌরি হিমবাহের গলন নিয়ে যে আষাঢ়ে গল্প প্রচার করেছেন তা যে কোন তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা নয় তা তাই সহজেই অনুমেয়। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স 'হিমালয়ান গ্লেসিয়ার – ক্লাইমেট চেঞ্জ, ওয়াটার রির্সোসেস এন্ড ওয়াটার সিকিউরিটি' নামক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে হিমালয়ের নিচের দিকের (কম উচ্চতার) হিমবাহগুলির কিছু মাত্রায় গলন অবশ্যই হচ্ছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে মাত্রায় গলন হওয়ার কথা সেই অনুপাতে গলন হলে তা হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীগুলিতে যে পরিমাণ জলের বৃদ্ধি ঘটাবে বলে অনুমান, হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীগুলিতে সেই পরিমাণে জল পাওয়া যাচ্ছে না। বাস্তবেও নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় যে বর্ষার আগে হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীগুলিতে জলের পরিমাণ বাড়ে নি বরং কোথাও কমেছে। তাহলে আইপিসিসি-র বক্তব্যের ভিত্তি কি?

এর বিপরীতে ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অব হিমালয়ান জিওলজির তৎকালীন ডাইরেক্টর এ কে দুবে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে হিমালয়ের উচ্চস্তরের হিমবাহগুলি যথেষ্ট নিরাপদে আছে এবং সেগুলির কোন অস্বাভাবিক গলন হয় নি। ব্রিটিশ ওয়েদার অবজারভেটরি স্টাডিজ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে জানিয়েছিল যে বিগত ১৪৩ বছরের বেশি সময় ধরে উত্তরাখন্ডের আলমোড়ার কাছে মুক্তেশ্বর গবেষণা কেন্দ্রের তাপমাত্রা ঐ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা থেকে ৪° সেলসিয়াস কমেছে।

অর্থাৎ হিমালয়ের হিমবাহগুলি নিয়ে কার্যত কোন গবেষণা ছাড়াই এবং সামান্য যেটুকু গবেষণালব্ধ ফলাফল উঠে এসেছে তাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ না করেই পরিবেশবাদী বিজ্ঞান বিরোধী মতবাদের মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে।

(৪) এলনিনো, টর্নেডো, সমুদ্রের সাইক্লোনের সংখ্যাবৃদ্ধি যে ভূ-উষ্ণয়াননের জন্য বাড়ছে এ সম্পর্কে কোন গবেষণালব্ধ ফলাফল এখনও পাওয়া যায় নি। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের জলবায়ুর যে নিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে সেটা বলাই বাহুল্য। তবে তা কতটা প্রাকৃতিক কারণে আর কতটা মনুষ্যজনিত কারণে এই নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা খুবই অপ্রতুল। তবে পারমাণবিক বর্জ্য সমুদ্রে অবৈজ্ঞানিকভাবে নিক্ষেপ এর একটি মনুষ্যজনিত কারণ হতে পারে বলে অনেক বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

(৫) সমুদ্রের জলতলবৃদ্ধি নিয়ে বিগত চার দশকে বিশ্ব জুড়ে পরিবেশবাদীরা বিরাট প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং বলা হচ্ছে তা পৃথিবীর পূর্বের সকল ইতিহাস ছাপিয়ে যাবে এবং এর একমাত্র কারণ মনুষ্যজনিত বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য বরফ ও হিমবাহের গলন।

পৃথিবীকে একটি স্থির ও নিশ্চল বস্তু ধরলে, পৃথিবীর মহাদেশ-পাহাড় পর্বত-সমুদ্রের তলভূমি সবকিছুকে স্থির ও নিশ্চল ধরে নিয়ে **– "অমুক আয়তনের বরফ সমান হারে গলিয়ে তমুক আয়তন জল ওই স্থির সামুদ্রিক গামলায়** (সমুদ্রকে পরিবেশবাদীরা যেভাবে বিচার করেন) **ফেললে জলস্তর কতটা উঠতে পারে"** এই হল পরিবেশবাদীদের পরিবেশ চর্চা! এই ভ্রান্ত, মিথ্যা এবং অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রায় সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে গিলিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত করা হচ্ছে। পরিবেশবাদীদের এই প্রচারে বিজ্ঞানের ছিঁটেফোঁটাও নেই।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান অন্য কথা বলে। ভূ-বিজ্ঞানীরা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে বার বার প্রমাণ করেছেন পৃথিবী কোন স্থির নিশ্চল বস্তু নয়, সদা পরিবর্তনশীল একটি বস্তু। মহাকাশের সকল জৈব-অজৈব বস্তুই পরিবর্তনশীল। পৃথিবীর পরিবেশের একটি গতিশীল সাম্য ব্যবস্থা আছে। পৃথিবীর ভূত্বক এবং গুরুমন্ডলের উপরের অংশ কতগুলি কঠিন, শীতল বিরাট প্রস্তরখন্ডে বিভক্ত। একে লিথোস্ফিয়ারিক প্লেট বলে। এই প্লেটগুলি নিচের অর্ধতরল উষ্ণ পদার্থের তাপীয় পরিচলন স্রোতের জন্য একের তুলনায় অন্যটি উপর-নিচে বা পাশাপাশি সরণ হয়। এই সরণ হল কৌণিক সরণ। এই প্রক্রিয়াকে বলে **প্লেট টেকটনিক তত্ত্ব।** বর্তমানে এই প্লেটগুলির আকৃতি-আয়তন-ভর এবং প্লেটের সরণের মান ও অভিমুখ সুনির্দিষ্টভাবে মাপা যায়। এই প্লেট টেকটনিক প্রক্রিয়ায় কোথাও মহাদেশীয় প্লেটে ভাঙন ধরে নতুন প্লেটের জন্ম হয়ে মাঝে সমুদ্রের জন্ম হচ্ছে, কোথাও সমুদ্রতল একের তুলনায় অন্য স্থানে নেমে যাচ্ছে, কোথাও পর্বতমালার জন্ম হচ্ছে। পৃথিবীর উপরিতলে ভূমির সমান্তরালে অনুভূমিক বল ক্রিয়া করছে, কোথাও লম্বভাবে ক্রিয়াশীল বলের প্রভাবে মহাদেশের ঊর্ধ্বমুখী এবং বেসিনের নিম্নমুখী গমন ঘটছে। ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত, চ্যুতি, পর্বতমালার সৃষ্টি, সমুদ্রের সৃষ্টি ও বিস্তার, পলিসঞ্চয়, ভূ-চৌম্বকের মেরুর দিক পরিবর্তন সকল প্রকার ভূআলোড়ণ নিরন্তর চলছে। সাধারণভাবে সমুদ্রতলের ওঠা-নামা (Marine transgression and Marine regression)একটা নিরন্তর প্রক্রিয়ায় চলে এবং তা চলে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ ভূআলোড়ণের ফলে। মহাদেশের দিকে সমুদ্র এগিয়ে যাওয়াকে marine trarsgrestion এবং সমুদ্র মহাদেশ থেকে পিছিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে marine regression বলে।

আমাদের বঙ্গোপসাগরের কথা প্রথমে বিবেচনা করা যাক। "New Transgrerion & Regression prospect of Bangladesh : From Past to Future" - Noshin Sharmili, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; গবেষণাপত্রে বলা আছে গন্ডোয়াল্যান্ডের ভাঙনের পর ক্রিটোসিয়াস যুগে পেনিনসুলার ইন্ডিয়া দক্ষিণের

মহাদেশগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই সময়কাল থেকে বর্তমান বেঙ্গল বেসিনে সমুদ্র মহাদেশের দিকে এগিয়েছে (Marine transgression) বড় মাত্রায়। অলিগোসিন যুগ থেকে এখানে সমুদ্র মহাদেশ থেকে পিছিয়েছে গেছে (Marine regression)। মায়োসিন যুগে হিমালয়ের উত্থান শুরু হলে বেঙ্গল বেসিনে পুনরায় ফাটল ধরে এবং বেসিন পুনরায় নেমে যাওয়ায় আবার marine transgrcssion শুরু হয়। মায়োসিন যুগের মধ্যবর্তী সময়কালে সমুদ্রতল আবার উপরে উঠে আসায় বেঙ্গল বেসিনে পুনরায় marine regression শুরু হয়। প্লায়সিন যুগে বেসিনের উত্তর পূর্বাংশে হিমালয়ের দক্ষিণের বড় ধরনের ভূ-আলোড়ণ ও চ্যুতির ঘটনা ঘটে এবং marine transgression শুরু হয়। কোয়াটারনারি যুগ থেকে বড় তুষার যুগের মধ্যে ছোট তুষার যুগ – অন্তঃতুষার যুগ (glacial - interglacial) পর্যায়কালে সমুদ্রের ওঠা-নামা ঘটেছে। আজ থেকে ১২ হাজার বছর পূর্বে সর্বশেষ বরফ যুগের সময় সমুদ্রতল বর্তমানের তুলনায় ১০০ মিটার নিচে ছিল। বর্তমানে আমরা দেখছি যে ইন্ডিয়ান প্লেট বার্মা প্লেটের নিচে প্লাইসটোসিন যুগের শেষকাল থেকে ক্রমশ দক্ষিণ পূর্বে নেমে যাচ্ছে। এর সঙ্গে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব দিকে ইন্দো-বার্মা পর্বতমালা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। ফলে বঙ্গোপসাগরে এখন সমুদ্র মহাদেশ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে বা marine regression চলছে।

R D Muller et al (2008) : 'Long Term Sea Level Fluctuations Driven by Ocean Basin Dynamics' রচনায় বলা হয়েছে যে আজ থেকে ৮ কোটি বছর আগে সমুদ্রের জলতল বর্তমানের তুলনায় ৫৫০ ফুট (১৭০ মিটার) উঁচুতে ছিল। সামুদ্রিক ভূত্বক এর সৃষ্টি, সামুদ্রিক পলির সঞ্চয়, প্লেট সীমান্তের এবং প্রাচীন সমুদ্রের অবস্থান ও আকৃতিকে কম্পিউটারাইজড মডেলিং করে দেখা গেছে যে **যদিও বা পৃথিবীর মেরু এবং সুউচ্চ পর্বতমালার বরফ ও হিমবাহ বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য সম্পূর্ণ গলে যায়, অর্থাৎ পৃথিবী বরফ শূন্যও হয়ে যায় তবুও আগামী ৮ কোটি বছরে পৃথিবীর জলতল বর্তমানের তুলনায় ৭০ মিটার নেমে যাবে,** উঠে আসা তো দূরের কথা।

জিওলজিকাল সার্ভে অব নরওয়ের ভূবিজ্ঞানী বার্নহার্ড স্টেইনবার্জার এবং ওই সংস্থার অন্য বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে গত ৮ কোটি বছরে পৃথিবীর সমুদ্রের জলতল ১৭০ মিটার (৫৬০ ফুট) নেমে গেছে। এবং আগামীতেও এই জলতল আরও নামবে। সংবাদ সংস্থা রয়টারকে গত ৭ই মার্চ ২০০৮ স্টেইনবার্জার আরও বলেন যে এই প্রক্রিয়া বজায় আছে এবং আগামী ৮ কোটি বছরে সমুদ্রের জলতল উঠবে তো না, বরং আরও ১২০ মিটার নামবে। এই ঘটনা ঘটলে পৃথিবীর মানচিত্রেরও বদল ঘটবে। রাশিয়া স্থলপথেই আলাস্কার সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে।

সারাংশে বলা যায়, সমুদ্রের জলতলবৃদ্ধির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কারণ হলো পৃথিবীর ভূ-অভ্যন্তরস্থ আলোড়ণ (tectonic movement) এর কারণে মহাদেশ-পর্বতমালা ইত্যাদি সাপেক্ষে পৃথিবীর সমুদ্রত্বকের ওঠানামা। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও শীতলায়ন এর ফলে সমুদ্রের জলতলের হ্রাসবৃদ্ধি যে প্রভাব সৃষ্টি করে তা ভূআলোড়ন জনিত কারণের তুলনায় অতি নগণ্য। বিজ্ঞানীমহল এই সত্য জানার পরও নিশ্চুপ কেন?

বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রাবৃদ্ধিতে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও সমুদ্রের জলতলবৃদ্ধি নিয়ে বিশ্ব জুড়ে এমন অবৈজ্ঞানিক প্রচার কেন?

কার্বন ডাই অক্সাইড বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস এবং কখনওই বিষাক্ত নয়। প্রাকৃতিকভাবেই মানুষের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই জীবকূলের জৈবনিক প্রক্রিয়ায় তা পরিবেশে মুক্ত হয়ে এসেছে। পৃথিবীর জড় উপাদান থেকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সমস্ত জীবকূলের জন্য যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তার মুখ্য কাঁচা মাল হল কার্বন ডাই অক্সাইড। এই গ্যাস ছাড়া জীবকূলের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তবুও নিরীহ কার্বন ডাই অক্সাইডকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে কেন? **একমাত্র মনুষ্য দ্বারা বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রচারের একটা গভীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে, যা বিজ্ঞান তথা মানব সমাজের সাধারণ স্বার্থের পরিপন্থী।** পরিবর্তনশীল এই বস্তুজগতে মানব সমাজও পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞান শ্রেণীনিরপেক্ষ হলেও দর্শন শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বজুড়ে চলছে মুনাফার স্বার্থে পরিচালিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি। একচেটিয়ার যুগে এসে তা গভীর সংকটের মুখে। বর্তমানে এই সংকট চিরস্থায়ী রূপ নিয়েছে। এই সংকট হল অতিউৎপাদনের সংকট। অর্থাৎ মানুষের পকেটের জোর অনুসারে বাজারের চাহিদার তুলনায় উৎপাদিত সামগ্রি বেশি। বর্তমানে এই পুঁজিবাদী অর্থনীতি কোন প্রকারে টিকে থাকতে পারে আপাতভাবে সংকট থেকে রেহাই পেতে পারে – উৎপাদনের বিকাশ প্রক্রিয়ায় হ্রাস টেনে, সংকটের বোঝা শ্রমজীবীদের ঘাড়ে চাপিয়ে কিংবা নতুন উৎপাদন ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটিয়ে। বর্তমানে এই তিনটি উপায়ই অবলম্বন করা হচ্ছে। একদিকে শিল্পের বিকাশে হ্রাস টানতে পরিবেশ দূষণ ও বিশ্ব উষ্ণায়নের তত্ত্বকে সামনে এনে জনরোষ থেকে রেহাই পাওয়ার সুযোগ মিলছে, অন্যদিকে পুর্ননবীকরণযোগ্য ও **'গ্রীণ এনার্জির'** (যা বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নিষ্ক্রমণ করে না) নতুন বাজার সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। সোলার বিদ্যুৎ, ব্যাটারি চালিত পরিবহন এবং অন্যান্য শক্তি উৎপাদন ও তার বাজার সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। প্যারিস জলবায়ু সম্মেলন এবং তারপর হওয়া প্রতিটি সম্মেলনে বিশ্বের প্রথম সারির পুঁজিপতিরা ফসিল ফুয়েলসহ নতুন বিনিয়োগ নিয়ে বাজার ভাগ বাটোয়ারায় ব্যস্ত আছেন। কিন্তু শিল্প উৎপাদনে ফসিল ফুয়েল বা পারমাণবিক শক্তির বিকল্প এখনও উপস্থিত হয়নি। লিথিয়াম ব্যাটারি যে নতুন করে ভয়ানক পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে

একথা নিয়ে কিন্তু অধিকাংশ পরিবেশবাদীরা নিশ্চুপ। ব্যাটারি চালিত পরিবহন যা যন্ত্রকে চার্জ বা রিচার্জ করতে যে বিদ্যুতের প্রয়োজন হচ্ছে সেই কথাও প্রচারের আলোয় আসছে না। এই গ্রীণ এনার্জির নামে পুঁজিবাদকে আপাতভাবে টিকিয়ে রাখার বড় কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে। এর সাথে রয়েছে পরিবেশ সম্মেলনগুলিতে প্রতিটি রাষ্ট্র এবং বড় বড় শিল্প সংস্থার জন্য কার্বন বাজেট তৈরি করা এবং কার্বন বাণিজ্য নামে এক নয়া বাণিজ্যের সূচনা।

কার্বন বাণিজ্য কি? এদেশে এর সূচনা হয়েছে কি?

বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনগুলিতে বিগত তিন দশক ধরে বলা হচ্ছে মনুষ্যজনিত কারণে বিশেষত ফসিল ফুয়েল ব্যবহারবৃদ্ধির ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন ভয়াবহ মাত্রায় ঘটছে। শিল্প বিপ্লবের সময়কালে পৃথিবীর সারাবছরের গড় তাপমাত্রা (বেসলাইন ধরা হয়েছে ১৪° সেলসিয়াস) ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এই উষ্ণতাবৃদ্ধিকে ১.৫° সেলসিয়াস (পরবর্তীতে বলা হয়েছে ২° সেলসিয়াস) বৃদ্ধির মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। বলা হয়েছে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হয় প্রধানতঃ পাঁচটি প্রক্রিয়ায়। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের হিসাবে শিল্পোন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের চিত্র নিম্নরূপ ঃ –

ঘরোয়া এবং সাধারণ বাণিজ্যিক কাজে	–	১২%
ফসিল ফুয়েল ছাড়া অন্য জ্বালানি ব্যবহারে	–	৮%
শিল্পোৎপাদনে (ফসিল ফুয়েল থেকে)	–	১৬%
বিদ্যুৎ উৎপাদনে (ফসিল ফুয়েল থেকে)	–	৩১%
যানবাহনে ফসিল ফুয়েল থেকে	–	৩৩%

অর্থাৎ শিল্পোন্নত দেশে শিল্প উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং যানবাহন ব্যবহারে মোট নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইডের ৮০% দায়ী। এই নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে নানা চুক্তি হয়, জাতীয় স্তরে নানা কমিশন গঠিত হয় প্রতিটি দেশে। অতিরিক্ত কার্বন নির্গমনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নানা উপায়ে কার্বন ট্যাক্স বসানোর পরিকল্পনা হয়। সচল শিল্প উদ্যোগ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ও গাড়ি নির্মাণকারী সংস্থাগুলির অনেকে তাদের উপর কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমণের মাত্রা সীমিত করায় আপত্তি তোলে। তখন কার্বন বাণিজ্যের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত হয় আন্তর্জাতিকস্তরে।

কোন শিল্প বা বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা তার উপর রাষ্ট্র দ্বারা ধার্য করা কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের মাত্রার অতিরিক্ত কার্বন নিস্ক্রমণ ঘটাতে গেলে বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন সঞ্চয়কারী (বনসৃজনকারী) সংস্থার কাছ থেকে কার্বন ক্রেডিট সার্টিফিকেট কিনতে হবে। কার্বন নিঃসরণকারী সংস্থা যে পরিমাণে **কার্বন ক্রেডিট সার্টিফিকেট** অথবা **কার্বন অ্যালাউন্স** পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের কার্বন সঞ্চয়কারী সংস্থার কাছ থেকে কিনবে সেই পরিমাণে তার শিল্প উদ্যোগে নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড নিস্ক্রমণ ঘটাতে পারবে। যেমন **ইউরোপীয় ইউনিয়ন অ্যালাউন্স, ক্যালির্ফোনিয়া কার্বন অ্যালাউন্স**। সরাসরি বা দালাল মারফৎ অন্য পণ্যের মত এই সার্টিফিকেট ক্রয়-বিক্রিয় হয়।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ ও অসমের চা-বাগান-এ কার্বন বাণিজ্যের সূচনা হয়েছে। ১২ই জুলাই ২০২২, শীর্ষ চা বণিকসভার একাধিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে টি বোর্ড, টিআরএ এবং কার্বন ট্রেডিং বিশেষজ্ঞরা বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকের পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকাকে দেওয়া বিবৃতিতে টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সৌরভ পাহাড়ি বলেন "চা শিল্পে কার্বন ট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। পরিকল্পনাটি পরিবেশ বান্ধব হওয়ার পাশাপাশি বিকল্প আয়ের ব্যাপারটিও ওতোপ্রোতভবে জড়িত আছে।" টি আর এ-র সম্পাদক জগদীশ ফুকন উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন "বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্বন ট্রেডিং এর বিপুল সম্ভাবনা আছে। চা-শিল্পে এখনও কাজ শুরুই হয়নি। তাই টি বোর্ড যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে চা-বাগিচাগুলির সামনে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।"

এটা সকলেরই জানা আছে যে **উদ্ভিদমাত্রই অঙ্গার আত্তিকরণ প্রক্রিয়ায় বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডকে শোষণ করে।** একটি গাছ তার গুঁড়ি বা কান্ড এবং পাতার পাশাপাশি মাটিতে মূলের সঙ্গেও কার্বন সঞ্চয় করে। বর্তমানে এই সঞ্চিত কার্বনের পরিমাপ করার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি এসেছে। প্রধানত গাছের কান্ড বা গুঁড়ির আকার দেখে সঞ্চিত কার্বনের পরিমাপ করা হয়। এক বিঘা জমিতে কত গাছ লাগালে তাতে কত কার্বন সঞ্চয় হয় তা নানা মানদন্ডের উপর নির্ভর করে। এদেশে এখনও এই সঞ্চিত কার্বন মাপার সংস্থা খুব বেশি নেই। আন্তর্জাতিক স্তরের সংস্থাগুলির মাধ্যমেই প্রধানত এই কাজ হয় এবং তাদের মাধ্যমেই **'সঞ্চিত কার্বন খাতায় কলমে বিক্রি হচ্ছে।'** দেশের আরাকু ভ্যালি কফি বাগানে (অন্ধ্রপ্রদেশ) প্রথম কার্বন ট্রেডিং ব্যবসা শুরু হয়, কয়েকটি সংরক্ষিত জঙ্গলেও বর্তমানে এর সূচনা হচ্ছে।

কার্বন বাণিজ্য কিভাবে হয় তা আগেই বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে গাছ বা তাতে সঞ্চিত কার্বনের বাস্তবত কোন বেচাকেনা হয় না। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি (২০১৫)র পর বেশি কার্বন নিঃসরণকারী শিল্পোন্নত দেশের শিল্প সংস্থার উপর সীমার অতিরিক্ত কার্বন নিষ্ক্রমণে বাধা আছে। চুক্তি অনুসারে কার্বন সঞ্চয়কারি সংস্থার থেকে কার্বন নিষ্ক্রমণকারি সংস্থা কার্বন ক্রেডিট সার্টিফিকেট কিনতে পারে। কার্বন নিঃসরণকারী শিল্প সংস্থা কার্বন সঞ্চয়কারি সংস্থা থেকে যত বেশি কার্বন ক্রেডিট কিনবে অর্থের বিনিময় তত বেশি পরিমাণ কার্বন নিঃসরণের অধিকার সে পাবে।

এই লাভজনক নতুন ব্যবসায় মন্দায় আক্রান্ত বাগিচা মালিকসহ অরণ্যের মালিকরা ঝাপিয়ে পড়ছে। কার্বন ট্রেডিং এর নামে এই **'সবুজ ব্যবসা'** তাদের চাঙ্গা করে তুলেছে। কার্বন ট্রেডিং ব্যবসায়ে জড়িত ব্যবসায়ী বৈভব রায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকাকে বলেন

●২০ *পৃষ্ঠায় দেখুন* ➔

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

[অষ্টম পর্ব (তৃতীয় অংশ)]

মোটামুটি ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ইউরোপের উৎপাদন পদ্ধতিতে পুঁজিবাদের আগমন হতে থাকে। উৎপাদন পদ্ধতি হল মানুষের শ্রম (কায়িক ও মানসিক), শ্রম নিয়োগ করার উপাদান (অর্থাৎ প্রকৃতিতে থাকা বস্তুসকল), সেই প্রাকৃতিক বস্তুকে শ্রম দিয়ে রূপান্তর ঘটিয়ে পাওয়া হাতিয়ার (যাকে বলে সাধিত্র বা tools) সহ নতুন উৎপাদনের মালিকানা সম্পর্কিত বিষয়। তাই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে এসে পড়লো বিভিন্ন পণ্য, পণ্য তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সাধিত্র, যন্ত্র এবং মানুষের শ্রম। পুঁজিবাদে এগুলো পরিমাণগত বিচারে আগের তুলনায় বহুগুণ হল। গুণগত বিচারেও পণ্যের গুণ, সাধিত্রের গুণ, যন্ত্রের গুণ এবং মানুষের শ্রম নিয়োগের ক্ষেত্রেও গুণগত পরিবর্তন হল।

আগেকার সমাজের উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রমজীবীরা যে শ্রম দিয়ে উৎপাদন করতো, তার কত অংশ বেগার শ্রম তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট ছিল। দাস যুগে দাসেরা জানতো যে শ্রম দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের উপর তাদের কোন অধিকারই নেই। এই অধিকার হীনতার কারণ তারা মনে করতো পূর্বজন্মের কর্মফল, ভাগ্যের লিখন। সামন্ত ব্যবস্থাতেও ভূমিখাজনা ছিল বেগার শ্রমের ফল। এমনকী সামন্তপ্রভুর কৃষি জমিতে সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময় বেগার খাটতে হত। কিন্তু পুঁজিবাদে এসে পূরানো কায়দাটা পাল্টে গেল। এবার শ্রমজীবীদেরকে প্রভুরা স্বাধীন ঘোষণা করলো (অন্তত পুঁজিবাদী উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবীদের)। কিন্তু তাদের শ্রমসময়ের একাংশের মূল্য মজুরিরূপে দিলেও বাকি অংশের মূল্য দিল না। এটাও এক প্রকার বেগার শ্রম। অথচ সেটা গোপন রাখা হল। ফলে এক রহস্যময় কারণে পুঁজির জন্ম হয়ে চললো। পুঁজিবাদ পুরানো উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণে ও গুণে বিকাশ ঘটিয়েছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ব্যবহার বহুগুণ বেড়ে গেল। পণ্য উৎপাদনে সাধিত্র ও যন্ত্রের ব্যবহারে বিকাশের সাংঘাতিক চাহিদা তৈরি হল। শ্রমজীবীদের শ্রমের ব্যবহার বহুগুণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রমকে কিরূপে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহার করলে তার উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বাড়ে, তার জন্য প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা হল। আবিষ্কার হল ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবস্থা। এতে কোনো একটি পণ্য উৎপাদন আর হয় না কোনো এক ব্যক্তির শ্রমে। বরং একই পণ্য উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমকে ভেঙে ফেলা হল, এই বিভাজিত এক একটা শ্রমের একককে আবার পরস্পর যুক্ত করা হল। একেই মানুষের শ্রম নিয়োগের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন বলা হচ্ছে।

অনেকের ধারণা আছে যে স্টিম ইঞ্জিনের উদ্ভাবন শিল্প বিপ্লবের কারণ। বাস্তব ইতিহাস তা নয়। স্টিম ইঞ্জিনের আগমনের অনেক আগে থেকেই ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়ে গেছিল। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত ধারণা এখানে দেওয়া হল, তার প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের বৃদ্ধি ও বিকাশ তাড়না সৃষ্টি করেছিল সমগ্র সমাজে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এবং উদ্ভাবনে। বিশাল এই শ্রমের বাজারে এবং পণ্যের বাজারে পুরানো ভাবনা চিন্তা, শিক্ষা-সংস্কৃতি একেবারেই মানানসই নয়। তাই আমরা দেখেছি পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত, জীবন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ শুরু হয়েছিল এই পুঁজিবাদের আগমনকালে ইউরোপে।

ফ্লেমিশ চিকিৎসক **জান ব্যাপটিসট ভ্যান হেলমন্ট** একটা অদ্ভুত পরীক্ষা করেছিলেন। এই পরীক্ষাটি ছিল একটি উইলো গাছের বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান। তিনি একটি মাটির পাত্র এবং একটি উইলো চারা নিয়েছিলেন এবং মাটির পাত্র এবং উইলো গাছকে আলাদাভাবে ওজন করেছিলেন। তারপর তিনি সূর্যালোকে উইলো গাছটি রোপণ করেছিলেন এবং প্রতিদিন জল দিতেন। পাঁচ বছর সালোকসংশ্লেষ করার পর তিনি গাছটি বের করে ওজন করেন। গাছটির ওজন বেড়ে হয়েছে তখন ১৫০ পাউন্ড। তিনি মাটির পাত্রটি ওজন করলেন এই ভেবে যে গাছের ওজন মাটির পাত্র থেকে এসেছে, কিন্তু পাত্রের ওজন দেখা গেল প্রায় একই রয়েছে। তখন তাঁর ধারণা হল, এই বর্ধিত ওজন সময়ান্তরে যে জল দেওয়া হয়েছে, তা থেকে এসেছে। এই ধারণা ভুল ছিল। কারণ সালোকসংশ্লেষের যে রাসায়নিক সমীকরণ রয়েছে, সেখানে বিক্রিয়াটি হচ্ছে জল ও বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যে। এই বিক্রিয়াটি হয় সবুজ ক্লোরোফিলে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে। এমন ভুল ধারণার উৎস হল বাতাস কি বস্তু, সে সম্পর্কে মানুষের ধারণার অভাব। অথচ হেলমন্ট-

এর এই পরীক্ষার মধ্যকার লক্ষ্যটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ। জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশ হল রাসায়নিক পরিবর্তন এই ভাবনাটি নিহিত রয়েছে এমন পরীক্ষায়। রাসায়নিক পরিবর্তনকালে মৌলিক কণাগুলির অবস্থান পরিবর্তন হয়ে তা ঘটে কিনা, সেটাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। তাই তিনি চারা অবস্থায় সব কিছুর ওজন মাপলেন (বাতাস ছাড়া)। গাছের বৃদ্ধির পরও তাই করলেন। আধুনিক রসায়নের স্রষ্টা ফরাসী **বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ের** অনেক আগে তিনি এই প্রয়াস রেখেছিলেন। ফলস্বরূপ ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে এই অধ্যয়নের অপরাধে স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের এজেন্টরা তাঁকে গ্রেফতার করে। ভ্যান হেলমন্ট শুধু এখানেই থেমে থাকলেন না। তিনি বাষ্প নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। সেসময় কিছু কিছু উদ্বায়ী পদার্থের বাষ্পীভবন এত দ্রুত হতো দেখে তাদের স্পিরিট বা আত্মার সঙ্গে তুলনার চল ছিল। এই তুলনা থেকে আজও 'স্পিরিটস অফ অ্যালকোহল' কথাটা চালু আছে। তিনি জ্বলন্ত কাঠের টুকরো থেকে বাতাস বের হয়ে (গ্যাসকে বাতাস থেকে তখনও আলাদা করা যায় নি) তা চিহ্নিত করেন। ফ্লেমিশ উচ্চারণে তা হল গ্যাস। এভাবে বাতাস থেকে পৃথক করে একটি গ্যাস তিনি প্রথম চিহ্নিত করলেন, যা আজকে কার্বন ডাই অক্সাইড নামে পরিচিত।

১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে **টরি সেল্লী প্রমাণ করলেন বাতাসের চাপ।** তিনি দেখালেন বাতাস পারদ স্তম্ভকে তিরিশ ইঞ্চি পর্যন্ত খাড়া করে রাখতে সক্ষম। এই বাতাস যে একাধিক গ্যাসের সমষ্টি তা আগে প্রমাণিত হয়ে গেছে। ফলে কিমিয়াবিদদের মৌলিক পদার্থের ধারণায় অন্যতম বাতাস যেমন আর মৌলিক পদার্থ রইলো না, তেমনি বাতাসের চাপ যে গ্যাসের চাপ এই ধারণারও সূত্রপাত ঘটালো।

এরপরই এল বিখ্যাত বয়েলের বাতাসের চাপ-আয়তন-এর পরীক্ষা। ইতিমধ্যে ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে জার্মান পদার্থবিদ অট্টোভন গুয়েরিক আবিষ্কার করলেন এয়ার পাম্প। তিনি দুটি অর্ধগোলককে যুক্ত করে, ভেতর থেকে পাম্প দিয়ে বাতাস বার করে নিলেন। তারপর দেখা গেল দুইটি দলে ঘোড়া দিয়ে দুপাশে প্রবল টান দিলেও তা খুলছে না, কিন্তু ভিতরে পুনরায় বাতাস প্রবেশ করালে তা সহজেই খুলে যাচ্ছে।

আইরিশ রসায়নবিদ **রবার্ট বয়েল** এ বিষয়ে খুব উৎসাহী হয়ে পড়েন। তিনি গুয়েরিকের তুলনায় ভালো একটি এয়ার পাম্প বানান। তিনি এই পাম্প ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাতাসের উপর চাপ সৃষ্টি করে তার আয়তনের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হন। যদি চাপ তিনগুণ করা হয়, তবে আয়তন হয়ে যাচ্ছে একতৃতীয়াংশ। তাঁর এই পরীক্ষাটি ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হল। বয়েল তার প্রকাশিত গবেষণাপত্রে স্থির উষ্ণতায় পরীক্ষাটি করতে হবে এমন কথা না বললেও একই পরীক্ষা স্বতন্ত্রভাবে করেছিলেন ফরাসি পদার্থবিদ**এডমে ম্যারিওট্ট** ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি কিন্তু পরীক্ষা চলাকালীন স্থির উষ্ণতা রাখার বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন। তাই বয়েলের সূত্রটিকে (গ্যাসের উষ্ণতা স্থির থাকলে তার চাপ ও আয়তন সূত্র) ম্যারিওট্টের সূত্রও বলা চলে।

রবার্ট বয়েল ও এডমে ম্যারিয়ট্টের এই পরীক্ষা থেকে দেখা গেল বাতাস কিংবা বিভিন্ন গ্যাসকেও সংকুচিত ও প্রসারিত করা সম্ভব। এর অর্থ এই তথাকথিত মৌলিক পদার্থ (যা দিয়ে এই মহাবিশ্ব গড়ে উঠেছে বলে ধারণা ছিল) ও নিশ্চয়ই আরো ক্ষুদ্রতম কণার সম্মিলিত রূপ। চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই কণাগুলি কাছাকাছি চলে এসে মোট আয়তনের সংকোচন ঘটাচ্ছে। চাপের হ্রাসের ফলে বিপরীত ঘটনা ঘটছে। এখান থেকে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা পরম বস্তু পরমাণুর ধারণার পরীক্ষামূলক প্রমাণ আমরা পাই। ডেমোক্রিটাসের-এপিকিউরাসের ধারণার বাস্তব প্রমাণ লাভের পর এই তত্ত্বটি প্রকল্প না হয়ে উঠল প্রমাণিত সত্য, অন্তত সেই সময়কার পরিস্থিতিতে।

বাষ্প থেকে তরল, তরল থেকে কঠিন পদার্থের এই ভৌত পরিবর্তন আগে থেকেই দৃষ্টিগোচরে ছিল। তাই তরল (যেমন জল, যা পুরানো কিমিয়াবিদদের ধারণায় ছিল অন্যতম মৌলিক পদার্থ) এবং কঠিন পদার্থ সকলও এমনই মৌলিক কণা দিয়েই তৈরি – এটা বোঝা গেল। পুরানো কিমিয়াবিদদের তত্ত্বের অবলুপ্তি হল প্রায়। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট বয়েল একটি রসায়নবিদ্যার উপর বই লেখেন, নাম **'দ্য স্কেপটিকাল কেমিস্ট'** (অর্থাৎ সন্দেহজনক রসায়নবিদ)। তিনি এই বইতে রসায়নবিদ্যা সম্পর্কিত সন্দেহজনক ধোঁয়াশা উন্মোচনের প্রচেষ্টা রাখেন নতুন আবিষ্কারের আলোকে। তিনিই প্রথম এই বইতে অ্যালকেমিস্ট (alchemist) শব্দ থেকে al অংশটি বর্জন করে কেমিস্ট (chemist) শব্দটি অর্থাৎ রসায়নবিদ শব্দটি আনেন এবং রসায়নবিদ্যার নতুন নামকরণ হয় কেমিস্ট্রি। **রবার্ট বয়েলের মাধ্যমে রসায়নবিদ্যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেতে শুরু করলেও,** তখনও অন্য ধাতু থেকে সোনা তৈরি সম্ভব এই ধারণা কাটে নি। এমন ধারণা কিমিয়াবিদদের ছিল।

এই রচনার এই অংশের শুরুতে আমরা ইউরোপে পুঁজিবাদের আগমনের সংক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি। তার পরে আমরা ঠিক ঐ সময় কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-গবেষণা নিয়েও আলোচনা রেখেছি। মনে হতে পারে এই দুই, আপাত সম্পর্কহীন বিষয়। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন কিন্তু শিক্ষিত মহলে, বিশেষ করে বিজ্ঞানীদের চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। পুরানো

সংস্কারকে প্রশ্নের মুখে না ফেললে, তাকে সন্দেহ না করলে (রবার্ট বয়েল তাঁর বই-এর নামকরণই করেছিলেন সন্দেহজনক রসায়নবিদ) নতুন জ্ঞানের বিকাশ সম্ভব ছিল না। কথায় বলে ‘কূপমন্ডুক’ হল সেই ব্যাঙ বা মন্ডুক যে কুয়োর স্যাঁতস্যাতে অন্ধকারে বাস করে, জ্ঞানের আলো সেখানে পৌঁছয়নি। সামন্ত তন্ত্র পর্যন্ত মানব সমাজ যদি হয় এমন অন্ধকার কুয়ো, তবে পুঁজিবাদ সেখানে আলো নিয়ে এসেছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে তরান্বিত করেছে, তেমনি বৈজ্ঞানিক গবেষণাও অর্থনৈতিক অবস্থাতে ত্বরণ সৃষ্টি করে। এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। গ্যাসের আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের পর (১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত) মানব ধারণায় এল যে কোনো আবদ্ধ পাত্রে জলীয় বাষ্প বা স্টিম প্রবেশ করিয়ে, পাত্রের বাইরের গায়ে ঠান্ডা জল দিয়ে তাকে পুনরায় জলে পরিণত করলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে, তারফলে আবদ্ধ পাত্রের চার দেওয়ালে প্রবল চাপ সৃষ্টি হবে (গুয়েরিকের অর্ধগোলক পরীক্ষা স্মরণ করুন)। এমন অবস্থায় আবদ্ধ পাত্রের দেওয়ালের একটি যদি হয় গতিশীল (movable), তবে তা পাত্রের ভিতরে ঢুকতে চাইবে। এই গতিশীল তলটি আবার বাইরে বেরিয়ে আসবে, যদি আবদ্ধ পাত্রে পুনরায় স্টিমের প্রবেশ ঘটানো হয়। এভাবে ঐ গতিশীল তলটি ক্রমান্বয়ে এগোবে এবং পেছোবে। যদি অনুমান করা যায় যে ঐ গতিশীল তলটি একটি পিস্টনের অংশ, তবে এই প্রক্রিয়ায় পিস্টনটি চলতে থাকবে। একে একটি পাম্প চালানোর কাজে ব্যবহার করা যাবে। **এভাবেই ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করলেন থমাস সার্ভে নামের এক ইংরেজ। পরবর্তীকালে আরেকজন ইংরেজ নিউকামেন যন্ত্রটির খুঁটিনাটি সংশোধন করলেন।**

এই যন্ত্রটির সংস্কার করে জেমস ওয়াট আধুনিক স্টিম ইঞ্জিনের জন্ম দিলেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নতুন প্রযুক্তির জন্ম দিল এবং ইতিহাস দেখায় তা কিভাবে পুঁজিবাদকে বিকশিত হতে সাহায্য করেছিল। মানুষের শক্তিতে নয়, যন্ত্রের শক্তিতে চলতে থাকা বিশাল বিশাল কারখানার উৎপাদন বিশ্ব বাজারে ছড়িয়ে পড়লো। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য পুঁজিপতিশ্রেণী দখল নিতে চাইলেন বাকি বিশ্বকে। জন্ম হল পুঁজিবাদী উপনিবেশের।

তাই ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমরা দেখলাম আরো অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতো রসায়ন বিজ্ঞানের আংশিক বিকাশ যেমন হয়েছে, তেমনি তার প্রভাব সমাজেও পড়েছে। (ক্রমশ)

●১৭পৃষ্ঠার শেষাংশ

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান

“ইউরোপের উন্নত দেশগুলির সংস্থাগুলির কাছে ব্যবসা করার জন্য কার্বন ট্রেডিং এর সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক। এ নিয়ে তাদের উপর সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে আইন-আদালত, সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির চাপ আছে।”

কার্বন ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে নতুন গাছ সময়ান্তরে রোপণ জরুরি। এই গাছের বয়স অন্তত ৩ বছর হতে হবে। গাছ যত পুরানো হয় ততই তার দ্বারা কার্বন সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যায়। উত্তরবঙ্গের চা বাগানে যে প্রচুর পতিত জমি রয়েছে তাতে পরিকল্পনামাফিক গাছ লাগিয়ে কার্বন ট্রেডিং এর ব্যবসাকে আরও বিস্তারের পরিকল্পনা হচ্ছে। জার্মানির জি আই জে এবং বেঙ্গালুরুর ভি এন ভি নামক দুটি এই ব্যবসায় খ্যাতনামারা চা-বাগিচায় কার্বন ট্রেডিং এর কাজে প্রধান ভূমিকায় থাকবে। রেইন ফয়েন্ট অ্যালয়েন্স নামক একটি আন্তর্জাতিক এনজিও এই কাজে যুক্ত হচ্ছে।

এদিকে টি বোর্ডের সিদ্ধান্তে জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষী সমিতিও এই নয়া ব্যবসায় উৎসাহী হয়ে উঠেছে। সমিতি উদ্যোগ নিয়েছে যে জেলার চার হাজার একর জমিতে নিজেদের বাগানেই নতুন করে সবুজসৃজন করা হবে।

কার্বন বাণিজ্যের সমগ্র বিষয়টি থেকে বুঝে নিতে কারুরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমণের মাত্রা কমানো নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনের কর্তাব্যক্তি, আইপিসিসি বা তাদের সাঙ্গাত পরিবেশবাদী সংগঠনগুলি কতটা গভীরভাবে চিন্হিত! কার্বন ট্রেডিং এর বিস্তার বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমণের মাত্রা কতটা কমাবে তা নিয়ে মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। একদিকে গ্রীণ এনার্জির প্রসার এবং অন্যদিকে সবুজ ব্যবসা কার্বন ট্রেডিং পরিবেশবাদীদের দ্বারা প্রচারিত ‘মনুষ্যসৃষ্ট বিশ্ব উষ্ণায়ন’ কতটা কমাবে তা সময়ই বিচার করবে।

পরিশেষে বলা দরকার বৃহৎ অতিবৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্রসংঘ এবং আইপিসিসি-র মত প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বিশ্ব উষ্ণায়নের মডেলের পক্ষে যেসব বিজ্ঞানী ও পরিবেশবাদীরা আজ এত মিথ্যা ও অবৈজ্ঞানিক প্রচার করছেন ভবিষ্যতে উষ্ণায়নের পর্যায়কাল শেষ হয়ে পৃথিবীতে শীতলায়ন শুরু হলে পুজিপতিশ্রেণী নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ব্যবসার স্বার্থে নতুন পরিবেশবাদী মডেল তৈরি করে তার প্রচার প্রসার শুরু করবে – এটাই পরবেশবাদীদের ভবিতব্য কারণ পরিবেশবাদ কারণকে ফল এবং ফলকে কারণ হিসাবে দেখতে শেখায়। (ক্রমশ)

বিশেষ রচনা ঃ

খাবার আমিষ না নিরামিষ না ভেগান কোন খাবার যুক্তিযুক্ত

খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের সুস্থ থাকা – ভালো থাকা। এ নিয়ে ধোঁয়াশাও কম কিছু নেই। কেউ বলে আমিষ ভালো খাবার কেউ বলে নিরামিষ খাওয়াটা খুব মঙ্গল স্বাস্থ্যের জন্য। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তো নিরামিষ খাওয়ার ব্যাপারটায় খুব উৎসাহ দেওয়া হয়। এই বিতর্কে মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার ইতিহাসটা একবার শুরু থেকে দেখে নিলে পরিষ্কার করা যাবে এই ধারণাকে যে কোন্ ধরণের খাদ্য আমাদের জন্য যুক্তিযুক্ত।

বিবর্তন ও খাদ্য

গত ৭০,০০,০০০ থেকে ৪০,০০,০০০ বছর পর্যন্ত সময়টা আবির্ভূত হবার ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ তখনই চারপেয়ে থেকে দুপায়ে চলার প্রাথমিক মানুষের আকারের জীবে পরিবর্তিত হয় এবং আমরা পাই প্রথম মানুষ অস্ট্রালোপিথেকাস, ঠিক এর আগের ধাপটা হচ্ছে রামাপিথেকাস যে কিনা বানর (প্রাইমেট) এবং মানুষের একই পূর্বপুরুষ ড্রাইওপিথেকাস থেকে বিবর্তিত। এরপরে আরো দুটো ধাপ – হোমো ইরেকটাস আর নিয়ান্ডারথেলিস পেরিয়ে আবির্ভূত হয় হোমো স্যাপিয়েন্স বা আধুনিক মানুষ, আজ থেকে মাত্র ৩ লক্ষ বছর আগে। মানুষ সহ শিম্পাঞ্জি ওরাং ওটাং ইত্যাদি উন্নত বানর শ্রেণীর সবাইকে মিলেই বলা হয় হোমিনিড বা প্রাইমেট।

প্রথম দিকে অর্থাৎ বানর (আদি প্রাইমেট) থেকে রামাপিথেকাস ও অস্ট্রালোপিথেকাস পর্যায়ে মানুষ বানরের মতোই ছিল শাকাহারী। শাকাহারী হলে সেই প্রাণীর অন্ত্র খুব বড় হতে হয়, কারণ তার পরিপাকের জন্য অনেক লম্বা প্রক্রিয়ার প্রয়োজন পড়ে। তাই অস্ট্রালোপিথেকাস আর বানরের অন্ত্রের আকারে আর তার মস্তিষ্কের আকারের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। আধুনিক মানুষের তুলনায় সেটা একেবারেই অন্যরকম। আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের আকার অস্ট্রালোপিথেকাস ও বানরের মস্তিষ্কের তিন গুণ এবং অন্ত্রের আকার পাঁচ ভাগের এক ভাগ। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধীরে ধীরে পাল্টে গেছে কিন্তু এই দুটো অঙ্গ অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও অন্ত্র এক সঙ্গে আলোচনায় আনা হলো এই কারণে যে এদের সম্পর্কটা মানুষের দেহ-মনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রধান উপজীব্য। এটা রাতারাতি ঘটেনি এর পেছনে আছে দীর্ঘ সংঘর্ষ এবং প্রতিকূলতাকে জয় করার ইতিহাস। বিবর্তনের প্রক্রিয়াটা এগিয়ে চলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের (ন্যাচারাল সিলেকশন) নিয়ম মেনে। সেটা কী রকম একটু পরিষ্কার করা দরকার। যেমন ধরুন গাছে খাবারের অভাব হেতু বাঁদরদের খাবারের সন্ধানে নিচে মাটিতে নেমে আসতে হচ্ছিল এবং মাটিতে নেমে এসে উঁচু জঙ্গল বা ঘাস পেরিয়ে তাকে দেখতে হচ্ছিল সামনে অদূরে খাবার কোথায় আছে বা শত্রু ঘাসের আড়ালে তাকে শেষ করে দিতে লুকিয়ে আছে কিনা। এটা করতে গিয়ে যারা পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের পা দুটো ওপরে তুলে নিজেকে লম্বা করতে পেরেছে তারা ওই অবস্থায় খাবার পেয়ে এবং শত্রুর হাত থেকে বেঁচে থাকার সম্ভাবনার দিক থেকে বেশি সুবিধাগ্রস্ত হয়েছে। এইরকম ব্যবহার যেসব বাঁদররা অভ্যেস করে উঠতে পেরেছে তারা খাবার যেমন ভাল পেতে সুযোগ পেয়েছে তেমনি শত্রুর হাত থেকেও বেশি সংখ্যায় বাঁচতে পেরেছে। যারা করতে পারেনি তারা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়েছে। এই দুপায়ে চলা যাদের মধ্যে বেশি করে চর্চিত হয়েছে তারা এগিয়ে গেছে এবং টিকে গেছে। সরলভাবে এটাই প্রাকৃতিক নির্বাচন বা ন্যাচারাল সিলেকশন। সমস্ত ছোট-বড় বিভিন্ন ধাপে এই ধরনের নির্বাচন একটা নতুন প্রাণী গোষ্ঠী জন্ম দিয়ে এসেছে এবং আগামী দিনের দিকে এই প্রক্রিয়াতেই বিবর্তন এগিয়ে চলেছে। সামনে পা দুটো যারা একটি শস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে তাদের একটা উন্নত অঙ্গ, হাত তৈরি হয়েছে যেটা তাকে আরো এগিয়ে দিয়েছে এবং যারা এভাবে তৈরী হতে পারেনি তারা শেষ হয়ে গেছে। সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে এরকম ঘটলেও হাতের কথা বলা হলো এই কারণে যে একটা উদাহরণ দেখানো যে হাতের জটিলতা যত বেড়েছে তার সঙ্গে একই মাত্রায় মস্তিষ্কের আকার ও জটিলতা বেড়েছে। লক্ষ্য করলেই দেখবেন অস্ট্রালোপিথেকাসের খুলি চোখের ওপরের দিকে যেটাকে কপাল বলি সেটা একেবারেই কিছু নেই সেটা চলতি কথায় কপাল খারাপ বললেও খারাপ আসলে তার ভেতরে থাকা মস্তিষ্ক – কারণ তার মস্তিষ্কে সামনের অংশ বা ফ্রন্টাল লোব যেটা আমাদের কপালের অভ্যন্তরে থাকে সেটা তেরি হয়নি তখনো। এইরকম পরিবর্তন ঘটে দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেই, এই যেমন মানুষের জটিল শব্দ তৈরী করার মতো তার ভয়েস বক্স অর্থাৎ লারিংস উন্নত হয়েছে, ভোকাল কর্ড উন্নত হয়েছে – সঙ্গে সঙ্গে নতুন শব্দ তৈরি করা, জটিল শব্দবন্ধ তৈরি করার মত মস্তিষ্কেরও সমান তালে পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় সেটা হচ্ছে তার খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন।

কেন এলো খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন?

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং দীর্ঘস্থায়ী – এক লক্ষ বছরের তুষার যুগ পৃথিবীতে এসেছিল ২৫ লক্ষ বছর আগে। সেই দুঃসহ অবস্থায় অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। যারা ওই কঠিন প্রতিকূলতাকে জয় করেছিল তাদের ধারাবাহিকভাবেই আমরা এখন টিকে আছি না শুধু ধারাবাহিকতার মধ্যেই সেই বিষয়টা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা অর্জন করার মত উন্নত অবস্থায় আছি। মোটা বরফের চাদরে সারা পৃথিবী ঢেকে যাওয়াতে খাদ্য পাওয়া একটা তীব্র সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেটা দূর করতে মানুষের সেই পূর্বপুরুষ অস্ট্রালোপিথেকাস আমিষ খাওয়া ধরতে বাধ্য হয়। এটাই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে মানুষকে মানুষ তৈরি করার দিকে। কারণ শাকাহারী প্রাণীর ক্ষেত্রে দরকার হয় দীর্ঘ অন্ত্র। প্রথমদিকের অস্ট্রালোপিথেকাসের অন্ত্র বানরের মত আধুনিক মানুষের তুলনায় ৫ গুণ লম্বা প্রায় ১২৫ ফুট ছিল সেটা হোমো স্যাপিয়েন্স-এ এসে দাঁড়ায় ২৫ ফুট মাত্র। মাছ বা মাংস হল প্রোটিনে ভরপুর একটি খাদ্য। তাই মাশাহারি হওয়াতে অত লম্বা অন্ত্র দেহে ধারণ করার প্রয়োজন কমে গেল এবং তার জন্য শরীরের পুষ্টির যোগানও কম দরকার হলো সেই পুষ্টি মস্তিষ্কের দিকে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ খুলে গেল। আর দেহে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে মস্তিষ্কেরই সবচেয়ে বেশি পুষ্টি দরকার হয়। ১০০ গ্রাম পেশির তুলনায় ১০০ গ্রাম মস্তিষ্কের পুষ্টি দরকার হয় ২২ গুণ বেশি। সুতরাং মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিবর্তনের জন্য অতিরিক্ত পুষ্টি পাবার সম্ভাবনাটা এভাবে খুলে গেল। বিবর্তন দ্রুত এগিয়ে চলল। অর্থাৎ এটা বোঝা গেল **বিবর্তনে দিকনির্দেশ-কারি পরিবর্তন সূচিত করতে আমিষ খাদ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।**

খাদ্যে সেই বৈশিষ্ট্য কি মানুষকে মানুষ করতে পেরেছে?

বিবর্তনে আমিষ খাদ্যের প্রোটিনের ভূমিকা ছাড়াও আরো কিছু পুষ্টি উপাদান এই বিবর্তনে দিকনির্দেশকারী ভূমিকা রেখেছে বলে নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, যেটা আরো বেশি মাত্রায় স্পষ্ট হবে যদি আমরা আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যের পার্থক্যকারী উপাদান সমূহের ভূমিকা আমাদের সুস্থ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আলোচনা করি। সমস্ত পুষ্টি উপাদান তুলনা না করে স্বল্প পরিসরে প্রোটিন ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ আর দুটি বিষয়কে বিবেচনা করলে বুঝতে সুবিধা হবে। কারণ এই তিনটি বিষয় নিরামিষ এবং আমিষ খাদ্যকে চূড়ান্তভাবে আলাদা করে দেয়। আর এই তিনটি উপাদান ছাড়া মানুষের বৃদ্ধি ও রোগমুক্ত জীবন সম্ভব নয়। এই তিনটে হল **প্রোটিন, ভিটামিন বি টুয়েলভ** আর **ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড।** প্রোটিনের কথা আগেই বিবর্তনের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের দেহের প্রয়োজনে প্রোটিনের ভূমিকা বুঝতে কয়েকটা বিষয় জানা দরকার। প্রোটিন তৈরি হয় কতগুলি প্রাথমিক উপাদান **অ্যামাইনো অ্যাসিডের** সংযোগে। **শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন জোগাতে প্রায় ২০টি অ্যামাইনের অ্যাসিড দরকার যেগুলি ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।** এর মধ্যে শরীরে তৈরী হয় না এমন **৯টা অ্যামাইনের অ্যাসিড খাদ্য থেকে আহরণ করতে হয়। এদের বলা হয় এসেনশিয়াল অ্যামাইনের অ্যাসিড।**প্রাণিজ প্রোটিন থেকে সেটা সহজে পাওয়া যায় এবং শাকাহারীদের ক্ষেত্রে সেই কাজটা একটু কঠিন হয়ে পড়ে কারণ অনেক পরিমাণ ডাল শস্য জাতীয় খাদ্য মিলিয়ে খেলে এটা পাওয়া সম্ভব হয়। প্রোটিনের জাত বিচার করতে গেলে এই শর্তগুলি হচ্ছে – প্রথমত ওই খাদ্যে প্রোটিনের মোট পরিমাণ কতটা, দ্বিতীয়ত, তাতে এই ৯টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপস্থিতি কেমন এবং তৃতীয়ত, সেটা কতটা সহজপাচ্য এই শর্তগুলি বিবেচনা করে। মোদ্দা কথায়, কোনো প্রোটিন থেকে শরীরে কতটা বেশি অ্যামাইনো অ্যাসিড ব্যবহৃত হতে পারে তার ভিত্তিতে একটা তালিকা তৈরী হয় যেটা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। কারণ এই পদ্ধতি আন্তর্জাতিক সংস্থা ফাও-এর নির্দেশে এবং তত্ত্বাবধানে তৈরী। একে বলে DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score)। এই তালিকা দেখলেই এক ঝলকে প্রোটিনের মান বুঝতে পারা যায়।

বিভিন্ন খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণের সারণী লক্ষ্য করুন।

খাদ্য	প্রোটিনের প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্য	প্রোটিনের মান (DIAAS)
ডিম	১৩	১১৩
মাছ	২৪	১১০
মাংস	২৬	১১১
দুধ	৩.৪	১১৪
সয়াবিন (ঘনীভূত করা)	৪০	৯১.৫
ডাল	৮	৫৭
চাল	১০.৯	৫৯
গম	১২.২	৪০.২

সব আমিষ খাদ্যে এই অ্যামাইনো অ্যাসিড মানুষের প্রয়োজনের নিরিখে ভালো পরিমাণে এবং সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। নিরামিষ খাওয়ার মধ্যে সেটা পাওয়া অতটা সহজ নয়। একমাত্র দুধ বা দুধের থেকে তৈরি করা বিভিন্ন জিনিস যেমন ছানা, চিজ এইগুলি দিয়ে ওই অভাবটা নিরামিষ খাদ্যে মেটাতে হয়। কিন্তু দুধ বা দুগ্ধজাত খাবারের প্রোটিনের মান ভালো হলেও পরিমাণ কম তাই মাংস বা ডিমের তুলনায় বেশি খেতে হয়। একজন পরিণত বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০ গ্রাম প্রোটিন খাওয়া দরকার যেটা নিরামিষ খাদ্য থেকে ঠিক মানের প্রোটিন হিসেবে খেতে গেলে প্রতিদিন অন্তত ৫০ গ্রাম ডাল, ৫০ গ্রাম সোয়াবিন, ৮০০ মিলি দুধ, ৫০ গ্রামেরও বেশি বাদাম, সিম জাতীয় সবজি, ১০০ গ্রাম চালের ভাত সহ খেতে হবে। সমমানের প্রোটিন খেতে একজনকে আমিষ খাদ্যে নিতে হবে ৫০ গ্রাম মাছ, ১০০ গ্রাম মাংস এবং ১০০ গ্রাম সবজি, ২০ গ্রাম ডাল। দামের দিক থেকেও এই নিরামিষ খাদ্যের দাম আমিষ খাদ্যের তুলনায় বেশি। সুতরাং পরিমাণের দিক থেকে বেশি পরিমাণে যেহেতু খেতে হয় সেহেতু খাওয়ার জন্য সময়ও বেশি দরকার হয়। প্রাণীজগতের দিকে তাকালে যেটা বেশি মাত্রায় দেখা যায় যে তৃণভোজী প্রাণীরা সারাদিন শুধু খেতে থাকে। সেখানে মাংসাশী প্রাণী যেমন বাঘ, সিংহ ৩ থেকে ৭ দিন পরে একবার খায়।

মস্তিষ্কের বৃদ্ধিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান হলো ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। এটার উৎসও হল প্রাণীজ প্রোটিন। এই ফ্যাটি অ্যাসিড ৩ রকমের হয়। তার মধ্যে দুটো ডি.এইচ.এ. (DHA - deoxyhexanoic acid) আর ই.পি.এ (ecosa pentanoid acid) একমাত্র মাছ, ডিম, মাংস বা দুধে পাওয়া যায়। নিরামিষ খাদ্যে দুধ ছাড়া আর কিছুতেই এগুলি থাকে না এবং তৃতীয়টি অর্থাৎ এ.এল.এ. (ALA - alpha lenolenic acid) অল্প পরিমাণে বাদাম জাতীয় খাদ্যে যেমন কাঠবাদাম (ওয়ালনাট), সয়াবিন বা তার থেকে নিষ্কাশিত তেলে পাওয়া যায় (যেমন সয়াবিন তেল, তিসির তেল [রেপসিড অয়েল]) ইত্যাদি।

তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আমাদের কোষের বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় সেটা হল ভিটামিন বি টুয়েলভ (সায়ানোকোবালামিন)। সেটির উৎস হল আমিষ খাদ্য। নিরামিষ খাদ্যের মধ্যে ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুমের মধ্যে এটা পাওয়া যায়, তবে প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাতে সেটা প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে – প্রতিদিন শুকনো করা ৫০ গ্রাম মাশরুম খাবার দরকার অর্থাৎ মাছ মাংস ডিমে যেমন পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক কম। সুস্থ থাকতে গেলে প্রতিদিন আমাদের ১.৫ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন বি টুয়েলভ লাগে সেটা নিরামিশাষী ব্যক্তিকে পেতে গেলে প্রতিদিন অন্তত ৪০০ মিলি দুধ খাওয়া দরকার। আমিষভোজীকে সেটা পেতে রোজ ৫০ গ্রাম মাছ খেলেই যথেষ্ট।

নিরামিষ খাওয়ার পক্ষে এত কথা হচ্ছে কেন?

প্রাণীজ প্রোটিনের এই বিশেষ গুণাবলী মানুষের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলির ক্ষেত্রে খাদ্যের ভূমিকাকে আরো স্পষ্ট করে। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে আজকাল নিরামিষ খাওয়া বা আরও এগিয়ে গিয়ে ভেগান খাবারের পক্ষে উচ্চ নাদে প্রচার চলছে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে নিরামিষ খাদ্যর ওপর জোর দেওয়া হয় কল্পিত ধারণার ভিত্তিতে। কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য ছাড়া। মূলত বলা হয় নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস মানুষের প্রকৃতি-স্বভাব সুস্থ ও উন্নত রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু বাস্তবে নির্দিষ্টভাবে দেখলে বা বৈজ্ঞানিক তথ্যে তার কোনো সমর্থন মেলে না। গুজরাটের দাঙ্গা একটা উদাহরণ হিসাবে দেখা যেতে পারে। সেখানে দাঙ্গায় নিরামিষ ভোজীদের হিংস্রতা কোনো ভাবেই কম ছিল বলা যাবে না।

প্রাণীজ প্রোটিন খাবার সঙ্গে কিছু রোগের সম্পর্ক আছে বলা হয়। যেমন যারা প্রাণীজ প্রোটিন খান তাদের মধ্যে হৃদরোগ বেশি হয় কিছু গবেষণা পত্রে দেখা গেছে। তেমনি এর বিরুদ্ধ মত হিসাবে নিরামিষভোজীদের মধ্যে উল্টো তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং অন্তত হৃদরোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে কোনো মতে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রাণীজ প্রোটিন পাশ্চাত্যে বেশি খাওয়া হয় এবং তার অনেকটাই হল প্রক্রিয়াজাত এবং সংরক্ষিত। এই ধরনের খাবার যারা খায় তাদের মধ্যে অন্ত্রের নিম্নভাগে অর্থাৎ কোলনে ক্যান্সার হবার প্রবণতা বেশি পাওয়া যায়। সেই জন্য বিজ্ঞানের হিসেবে সুষম খাদ্যের (ব্যালান্স ডায়েট) কথা বলা হয়। খাদ্যের ক্ষেত্রে একপেশে ধারণা অবৈজ্ঞানিক কারণ প্রাণীজ প্রোটিনে যেমন অতি আবশ্যিক জিনিস আছে তেমনি ভিটামিন খনিজ দ্রব্য বিশেষত ফাইবার পেতে শাকসবজি ফল খাওয়া জরুরী। মনে রাখতে হবে শুরুতে মানুষ শুধু শাকাহারী ছিল এবং আধুনিক মানুষের দেহেও সেই শর্ত বর্তমান অর্থাৎ উদ্ভিজ খাদ্য দেহে পুষ্টির যোগানে গুরুত্বপূর্ণ সেটা প্রাণীজ খাদ্যের সংযোগে দেহের পুষ্টিগত প্রয়োজন পরিপূর্ণ ভাবে মেটাতে পারে।

নিরামিষ খেলেও লাভ হতে পারে

বর্তমান সমাজে অনেকে যারা মতামত সৃষ্টিকারীর ভূমিকায় কাজ করে, সেলিব্রিটি-বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি বলে যাদের আমরা চিনি, তাদের অনেকেই এখন পরিবেশ, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলে নিরামিষ খাদ্যের প্রচার বাড়িয়ে তুলতে চাইছে।

উদাহরণ হিসাবে হলিউডের নামকরা তারকা আর্নল্ড সোয়ারজেনেগার-এর নাম করা যেতে পারে। অনেকেই হয়তো জানেন ওনার নাম। ১০৭ কেজি ওজনের ৬ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা দীর্ঘদেহী এই শোম্যান নিজেই বলেছে অনেক পরিশ্রমে এই দেহ তৈরী করতে অনেক প্রাণীজ প্রোটিন এবং প্রতিদিন ২৫টা করে ডিম খেতে হয়েছিল কিন্তু এখন নিরামিষ খাওয়ার কথা বলছেন সবাইকে, নিজেও খাচ্ছেন। এই প্রচার এইরকম উচ্চ আয়ের লোকেরা অনেকে বলে থাকেন। আমাদের দেশেও এমন অনেক চিত্র তারকা খেলোয়ার আছেন। এরা উচ্চ ঘনত্বের প্রোটিন পাউডার, আবশ্যিক ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন বি টুয়েলব ইত্যাদি ওষুধের মতো সম্পূরক (সাপ্লিমেন্ট) হিসেবে নিয়ে অসুস্থ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে। এরও উদ্দেশ্য আছে। লক্ষ্য নতুন নতুন পণ্য বাজারজাত করা। বাজারের স্বার্থে সবকিছুই চালানো যেতে পারে এবং সেটা করতে গিয়ে অর্ধসত্য চালাতে হয়। একটা উদাহরণ পঞ্চাশের দশক থেকেই চালু হয় প্রক্রিয়াজাত খাদ্য (প্রসেস্‌ড ফুড) নানান প্যাকেটে করে। যদিও তখনই জানা গিয়েছিল প্রক্রিয়াজাত করলে প্রয়োজনীয় যে ফাইবার, বিশেষ করে প্রাণীজ প্রোটিনের ক্ষেত্রে সেটা এতটাই খারাপ হয় যে তার খাদ্যগুণ কমে যায়। তা সত্ত্বেও এটা চলছে। এখন নতুন বাজার নতুন পণ্যের জন্য খোলার চেষ্টা হচ্ছে। নিরামিষাশী বা ভেগান হতে গেলে বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক খাদ্য (সাপ্লিমেন্ট) না খেতে পারলে সুস্থভাবে বাঁচা সম্ভব নয়। এই সম্পূরক খাদ্যের বাজার ইতিমধ্যেই বিরাট হয়ে উঠেছে ২০২২-এ সম্পূরক খাদ্যের বাজার এখন ১৫৫২০ কোটি ডলারের। যেটা ধারণা করা হচ্ছে ২০২৭-এর মধ্যে সেটা বেড়ে হবে ২২০৮০ লক্ষ ডলারের। অর্থাৎ একটা বড় বাজার তৈরি হয়েছে এবং বেড়ে চলেছে। সুতরাং এই ধরনের খাবার খেলে লাভ নিশ্চয়ই হচ্ছে। লাভ বাজারের, পুঁজির মালিকদের।

সাধারণ মানুষ সেটা কেন করতে যাবে? এতে সাধারণ মানুষের কী লাভ? পরিবেশের কথাটা সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এমন আবেগের কথা যে প্রাণীজ প্রোটিন খেতে গেলে মানুষকে অপরাধীর সমতুল্য মনে হতে পারে।

খাদ্য শৃঙ্খলে খাদ্য এবং খাদকের যে প্রকৃতিগত সম্পর্ক আছে সেটা এইভাবে বিপন্ন হওয়ার দিকে যাচ্ছে। কেউ কেউ এমনকি নিজের বাবা-মার যন্ত্রণার কান্নার সঙ্গে পশুশালায় বধ হতে যাওয়া পশুর চিৎকারকে মিলিয়ে দিচ্ছে। মানুষ হিসাবে প্রাণীজ প্রোটিন খাবার নৈতিকতাই যেন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। মনে হবে যেন বাঘ-সিংহের হরিণ শিকার নিষিদ্ধ করে দেওয়া দরকার। প্রশ্নটা হল খাদ্যের প্রয়োজনে প্রাণী হত্যাটা সমস্যা না প্রয়োজনের বাইরে প্রাণীবধ করে লাভের অঙ্ক বাড়াবার সমস্যা। সেটা পরিষ্কার করে না বললে প্রাণীজ প্রোটিন খাওয়ার বিরোধিতা মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়ে দাঁড়াবে।

যেরকম খাদ্যের পুষ্টিগুণে মানুষ বিবর্তিত হয়ে এই উন্নত অবস্থায় এসেছে সেটা অস্বীকার করে নতুন কিছু শুরু করার আগে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সবার জেনে নেওয়া উচিত। না হলে এই বাজারি অর্থনীতির শিকার হয়ে মানুষকে অচিরেই তার মূল্য চোকাতে হবে। ■

সূত্রপঞ্জী

* The Evolution of Complex Organs, T. Ryan Gregory : Evo Edu Outreach (2008) 1:358-389DOI 10.1007/s12052-008-0076-1

* EMBO Rep. doi: 10.1038/embor.2008.61PMCID: PML 237337/PMID: 18451764/2008 May: 9(5): 413-415.

* Bodies;Human Characteristics: Bodies; Changing Body Shapes and Sizes/Smithsonian - National Musium of Natural History /https://naturalhistory.si.edu

* https://www.nationalgeographic.com/magazine/:The Evolution of diet

* Daily milk consumption and all-cause mortality, coronary heart disease and stroke a systematic review and meta-analysis of observational cohort tudies-Patrick Mullie, Cecile Pizot, Philippe Autier; BMC Public Health, 2016; 16:1236. Published online 2016 Dec 8. doi:10.1186/s12889-016-3889-9: PMCID: PMC5143456-PMID:27927192

*How Much Omega-3 Should You Take per Day? By Freydis Hjalmarsdottir, MS – Medically reiewed by Amy Richter, RD, Nutrition – Updated on October 13, 2022

* MARKETS AND MARKETS, Dietary Suppliment Market : published Date Apr. 2022:https://www.marketsandmarkets.com

*Dietary protein quality evaluation in human nutrition : FAO FOOD AND NUTRITION PAPER; ISSN 0254-4725V:31 March-2 April, 2011; Auckland, New Zealand.

বিজ্ঞানের আবিষ্কার ঃ

নিউট্রন আবিষ্কারের গল্প

– পঞ্চানন মণ্ডল

(প্রথম পর্ব)

সেই ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে জে জে থমসনের হাত ধরে আবিষ্কার হয়েছিল ইলেকট্রন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে রাদারফোর্ডের বিখ্যাত আফলা কণা বিক্ষেপণ পরীক্ষা দ্বারা সফলভাবে আবিষ্কার হলো প্রোটন কণা। পরিবর্তীতে অনেক পরীক্ষায় জানা গেল পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভর সেই প্রোটনকণাগুলোর মোট ভরের থেকে অনেক বেশি। তারপর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা হন্যে হয়ে ছুটেছেন এক রহস্যময় ভারী কণার খোঁজে। যে নাকি এই অতিরিক্ত ভরের জন্য দায়ী! কিন্তু সেই কণা খোঁজ পাওয়া সহজ কথা নয়! কারণ বড্ড বেশি নিষ্ক্রিয় কণাটা। তাই তাকে ধরা সহজ কথা নয়। তাকে ধরা ঘোলা জলে মাছ ধরার সামিল।

মনে করো একটা ডোবায় ভিন্ন ভিন্ন তিনটি জাতের কিছু মাছ আছে। কী মাছ, আর কটাই বা আছে তা তুমি জানো না।

ধরা যাক, তোমার দুটো জাল আছে। একটা জালের ফাঁকগুলো বেশ বড়, আরেকটা জালের ফাঁকগুলো ছোটো। ধরো জালগুলো এমনভাবে তৈরি, যেসব মাছের পিঠে কাঁটা আছে, শুধু তারাই আটকে যাবে। যাদের পিঠে কাঁটা নেই, তারা আটকাবে না। ধরা যাক ছোট ছিদ্রের জালগুলো দিয়ে তুমি ১০টা ট্যাংরা মাছ ধরে ফেললে। ১০টা কই মাছ ধরা পড়ল, বড় ছিদ্রের জাল দিয়ে। কিন্তু কিছুতেই এই দুই জালে অন্য মাছ ধরা পড়ছে না। নিশ্চয়ই এই মাছগুলো বড়-সড় হয়তো কই মাছের সমান বা কাছাকাছি তা-ই ছোট ফাঁকের জালে আটকাচ্ছে না। আর বড় ফাঁকের জালে ধরা পড়ছে না, কারণ মাছগুলোর পিঠে কাঁটা নেই, তাই সহজেই বড় জালের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মাছগুলো কি ল্যাঠা মাছ? হতে পারে, এদের কাঁটা নেই পিঠে, তাই কই ধরা জালের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে পারে। আবার এদের শরীর অনেকটাই গোলাকার আর পিচ্ছিল। কিন্তু ল্যাঠা হলেও ছোট নয়, কারণ ছোট হলে ট্যাংরা ধরার জালে আটকে যাবে। আবার এধরনের অন্য মাছও হতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত হতে হলে ধরতে হবে এদের যেকোনো একটা, তার জন্য লাগবে অন্যরকম জাল বা যন্ত্র!!

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রাদারফোর্ড প্রোটন আবিস্কারের পর ঠিক এমন একটা সমস্যায় পড়েছিলেন! ততদিনে রাদারফোর্ড তাঁর পরমাণু মডেল প্রকাশ করেছেন (১৯১১ খ্রিঃ)। আমরা এখন জানি তাতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল, সেগুলো দূর করতে বোর **ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের** কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বোর পরমাণু মডেল প্রকাশ করেন (১৯১৩ খ্রিঃ)। কিন্তু প্রথমে বোরের পরমাণু মডেল একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন বিশিষ্ট পরমাণু অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর ধর্ম ও গুণাগুণ বেশ ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল। কিন্তু যেসব পরমাণুতে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যা একাধিক, সেগুলোর জন্য বোর মডেল ঠিকঠাক মতো কাজ করছিল না। তাই বোর মডেলটাকে সংশোধন করে নতুন মডেল বোর-রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল দাঁড় করলেন। এতে একাধিক ইলেকট্রনের বিন্যাসটা ব্যাখ্যা করলেন ঠিকই কিন্তু একাধিক প্রোটনের নিউক্লিয়াস কেমন হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। প্রোটন আবিষ্কারের পর সবাই ধরেই নিয়েছিলেন, ঝামেলা চুকে গেছে। ইলেকট্রন-প্রোটনের একটা করে জোড়া মিলে পরমাণুকে আধান নিরপেক্ষ মানে নিস্তড়িত করে দেয়। তাই সকল পরমাণুই আধান নিরপেক্ষ। যেমন হিলিয়ামে দুটি ইলেকট্রনের বিপরীতে এর নিউক্লিয়াসে দুটি প্রোটন থাকে, তেমনি অক্সিজেন পরমাণুর ভিতরে থাকে আটটি প্রোটন আর বাইরে আটটি ইলেকট্রন।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভিতরে যদি শুধু প্রোটন থাকবে তাহলে এদের ভরের থেকে নিউক্লিয়াসের ভর বেশি কেন? ওখানে অন্য কেউ নেই তো! যে ডোবার জলের তৃতীয় রকম মাছের মতো, ধরা দিচ্ছে না! শুধু ঝামেলা পাকাচ্ছে?

(দ্বিতীয় পর্ব)

কণা পদার্থবিজ্ঞানের জগৎটা এতো সহজ সরল নয়। অচিরেই রাদারফোর্ডের নজরে এলো নতুন এক সমস্যা। হিলিয়াম নিউক্লিয়াস বা তাঁর প্রিয় আলফা কণাতেই সমস্যাটা দেখা দিল। তিনি দেখলেন, হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস অর্থাৎ একটা প্রোটনের যে ভর মেপেছিলেন, হিসাব অনুযায়ী আলফা কণার ভর তার দ্বিগুণ হওয়ার কথা। কিন্তু হিসাব কষে দেখলেন, একটা আলফা কণার ভর চারটি প্রোটনের ভরের

সমান। তাহলে তার হিসাব তো মিলছে না! তখন তিনি অন্যান্য মৌলের পরমাণু নিয়েও পরীক্ষা করে দেখলেন, ঠিক যতটা প্রোটন থাকার কথা সবগুলোর নিউক্লিয়াসের ভর যাওয়া যাচ্ছে তার দ্বিগুণ। যেমন অক্সিজেন নিউক্লিয়াসের ভর হওয়া উচিত ছিল ৮টি প্রোটনের সমান। কিন্তু যাওয়া যাচ্ছে ১৬টি প্রোটনের ভরের সমান। এই বাড়তি ভর কোত্থেকে এলো? রাদারফোর্ড সহ অন্য বিজ্ঞানীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

এর একটা সমাধান তখন রাদারফোর্ডই বের করেছিলেন। যদিও সেটা পরে ভুল প্রমাণিত হয়। তিনি বললেন, পরমাণুতে যতগুলো প্রোটন আছে বলে মনে করছি, তার আসল সংখ্যা হয়তো তার দ্বিগুণ। তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে বাড়তি প্রোটনের কারণে পরমাণুগুলো আর আধান নিরপেক্ষ থাকে না। ধনাত্মক আধানযুক্ত হওয়ার কথা। রাদারফোর্ড, তার সমাধানও দিলেন। বললেন, নিউক্লিয়াসে যে-কটি বাড়তি প্রোটন থাকবে, ঠিক ততগুলো ইলেকট্রনও গাদাগাদি করে থাকবে, নিউক্লিয়াসের ভেতরের যেহেতু ইলেকট্রনের ভর কম, তাই সেগুলোর ভর নিউক্লিয়াসের ভরে কোনো প্রভাব ফেলে না!

তাহলে হিসাবটা এমন দাঁড়ালো, হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে চারটি প্রোটন আর দুটি ইলেকট্রন, আর নিউক্লিয়াসের বাইরে কক্ষপথে থাকে আরও দুটি ইলেকট্রন, সব মিলিয়ে হিলিয়াম পরমাণু আধান নিরপেক্ষ! তেমনি অক্সিজেন নিউক্লিয়াসে থাকে ১৬টি প্রোটন ও ৮টি ইলেকট্রন। অন্যদিকে নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকে ৮টি ইলেকট্রন। আর এই মতবাদের নাম দেওয়া হলো নিউক্লিয়াসের প্রোটন-ইলেকট্রন মতবাদ।

অনেক বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্ব পেয়ে ভাবলেন কণা পর্দার্থবিজ্ঞানের এমনকী মহাবিশ্বের গঠনও তাহলে এতো সরল! মহাবিশ্বের সব বস্তু তাহলে দুটি মাত্র কণা দিয়ে তৈরি, ইলেকট্রন আর প্রোটন। আর গোটা মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে মাত্র দুটি বল – মহাকর্ষ আর তড়িৎ চুম্বকীয় বল!

কিন্তু অচিরেই এ ধারণা ধাক্কা খেল!

(তৃতীয় পর্ব)

গত পর্বে বলেছিলাম রাদারফোর্ড যখন দেখলেন ইলেকট্রনের সংখ্যার সমান প্রোটন থাকলে পরমাণুর কেন্দ্রকের ভর প্রোটনের ভরের প্রায় দ্বিগুণ হচ্ছে, তখন তিনি বললেন প্রোটন নিশ্চয়ই দ্বিগুণ আছে। তাহলে ইলেকট্রন থেকে প্রোটনের সংখ্যা দ্বিগুণ হলে পরমাণু নিস্তড়িৎ থাকবে কিভাবে? তার ব্যাখ্যায় বললেন যে ইলেকট্রন ও তখন প্রোটন সমান, মানে দ্বিগুণ বাড়াবে না। এটাই ছিল প্রোটন-ইলেকট্রন মতবাদ।

কিন্তু এই প্রোটন-ইলেকট্রন মতবাদ মার খেল কেন?

প্রথম কারণ, এই মতবাদ হার মেনেছে তড়িৎচুম্বকীয় বলের কাছেই। নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটা ইলেকট্রন আরেকটা প্রোটন না হয় পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকল কিন্তু প্রতিটা প্রোটনও অন্য প্রোটনদের বিকর্ষণ করবে কারণ তারা উভয়ই ধনাত্মক, আবার নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকা ইলেকট্রনগুলোও পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে। ফলে নিউক্লিয়াসের ভিতরে কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বলের চেয়ে বিকর্ষণ বলই বেশি কার্যকর হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই থাকার কথা নয়। এ এক মারাত্মক সমস্যা, এই সমস্যা কিন্তু নিউট্রন আবিষ্কারের পরেও ছিল, তা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। এখন ফেরা যাক প্রোটন-ইলেকট্রন হাইপোথিসিসের দ্বিতীয় সমস্যাটা নিয়ে।

এই সমস্যাটি কৌণিক ভরবেগ নিয়ে। **কণাদের কৌণিক ভরবেগ থাকতেই হবে, যেটাকে আমরা স্পিন বলি।** পাউলির অপবর্জন নীতির আগেই বিজ্ঞানীরা জানতেন কণাদের ঘূর্ণন আছে। আর যার ঘূর্ণন থাকবে, সে কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র মেনে চলতে বাধ্য।

কী সেই সূত্র?

আমরা শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের কথা জানি, তেমনি ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রও। আসলে নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রটাই ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রের আরেকটা রূপ। ধরো তোমার কাছে একটা বন্দুক আছে। তুমি সেই বন্দুক থেকে গুলি ছুড়লে। বন্দুক গুলিটির ওপর বল প্রয়োগ করবে, ফলে গুলি বেগ (ভরবেগ) প্রাপ্ত হবে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী গুলিটিও ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বন্দুকটির উপর সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করবে। ফলে বন্দুকটিও ভরবেগ প্রাপ্ত হবে, তুমি বন্দুকের ধাক্কা অনুভব করবে। অর্থাৎ শুরুতে বন্দুক আর গুলি উভয়েরই মিলিত ভরবেগ শূন্য ছিল। তুমি যখন গুলি ছুড়লে তখন বন্দুক এবং গুলি উভয়ই ভরবেগপ্রাপ্ত হলো। এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে, গুলি ছোড়ার সময় বন্দুক আর গুলি, উভয়েরই ভরবেগ কিন্তু সমান! গুলির ভর কম তাই বেগ বেশি, অন্য দিকে বন্দুকের ভর অনেক বেশি, তাই বেগ কম হবে। অর্থাৎ তখন যদি গুলির ভর আর বেগ গুণ করো তাহলে যে মান পাবে, বন্দুকের ভর আর বেগ গুণ করলেও সেই একই মান পাবে।

অর্থাৎ, শক্তির মতো মহাবিশ্বের মোট ভরবেগ শূন্য, শূন্য

থেকেই বল প্রয়োগ করে তুমি ভরবেগ সৃষ্টি করতে পারবে, তবে যে বস্তু দিয়ে প্রয়োগ করবে, সেই বস্তুও ভরবেগ প্রাপ্ত হবে। এই দুই ভরবেগ পরস্পরের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে, তাই এদের যোগ করলে মান পাবেন শূন্য। এটাই আসলে ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার নীতি।

তেমনি কৌণিক ভরবেগেরও সংরক্ষণশীলতার নীতি আছে। একেবারে শূন্য থেকে বল প্রয়োগ করে কৌণিক ভরবেগ তৈরি করতে পারো, সেক্ষেত্রে তুমি যে বস্তু দিয়ে কৌণিক ভরবেগ তৈরি করবে, সেই বস্তুও সমান কৌণিক ভরবেগপ্রাপ্ত হবে। এখন ধরো হাতে একটা ক্রিকেট বল আছে। তুমি আঙুল বা কবজির মোচড় দিয়ে বলটাকে স্পিন করলে। বলটা নিজে এসময় কৌণিক ভরবেগপ্রাপ্ত হবে, তোমার হাতকেও সমান কৌণিক ভরবেগ দেবে। কিন্তু বলের চেয়ে তোমার নিজের ভর এতই বেশি, সে তুলনায় তুমি তেমন বেগই (কৌণিক বেগ) লাভ করতে পারবে না। **ব্যাপারটা বুঝতে হলে তোমাকে আরেকটি সমান ভরের সমান আকৃতির ক্রিকেট বল নিতে হবে। এবার কংক্রিটের মেঝের ওপর বল দুটি পাশাপাশি রাখো, যেন গায়ে লেগে থাকে। এবার যেকোনো একটা বলকে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ছেড়ে দাও। দেখবে, এটা বলটা নিজে তো ঘুরছেই, অন্য বলটাকেও ঘুরিয়ে দিচ্ছে। খেয়াল করে দেখো, তুমি যদি যে বলটাকে ঘুরিয়ে দিলে, সেটা যেদিকে ঘুরছে, অন্য বলটা ঘুরছে তার বিপরীত দিকে!**

মেশিনের পেনিয়াম মানে টুথড হুইল দেখেছো? সব যন্ত্রেই এ জিনিস থাকে, খাঁজকাটা চাকা যেটাকে বলে। হাতের কাছে সহজেই মিলবে আখের রস বানানো মেশিনে। হাতলের সাহায্যে ছোট চাকাটাকে যখন ঘোরানো হয়, সেটা আবার বড় চাকাটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু দুটো ঘুরছে পরস্পরের বিপরীতে।

আসলে ভরবেগ ভেক্টর রাশি, তাই দুটো বিপরীতমুখী সমান ভরবেগকে তুমি যদি যোগ করো তাহলে তো মান শূন্য পাবে! এটাই আসলে কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি।

এই নিউক্লিয়াসের প্রোটন-ইলেকট্রন নীতিতেও কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতায় সমস্যা দেখা দিল। সব পরমাণুতে তা কিন্তু নয়। সমস্যাটা দেখা দিল যেসব নিউক্লিয়াসে বিজোড় সংখ্যক কণা থাকে সেগুলোতে। প্রোটন-ইলেকট্রন হাইপোথিসিস অনুযায়ী নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াসে ১৪টা প্রোটনের বিপরীতে থাকবে ৭টা ইলেকট্রন। প্রত্যেকের স্পিন বা কৌণিক ভরবেগ আছে। প্রোটনের ঘূর্ণন আসলে ১/২। সেটা +১/২ হতে পারে। পাউলির অপবর্জন নীতি অনুযায়ী অবস্থানের ওপর নির্ভর করবে। ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের মানও একই। এখন কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুযায়ী কোনো একটা বস্তুতে যদি অনেকগুলো কণা থাকে, তাহলে তাদের স্পিন নম্বরগুলো যোগ করলে হয় পূর্ণ সংখ্যা হবে, নইলে শূন্য হবে। কখনো ভগ্নাংশ সংখ্যা হতে পারবে না। তাহলে লঙ্ঘিত হবে কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার নীতি। তাই এই নীতি ঠিক রাখতে হলে অবশ্যই নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা জোড় হতে হবে। বিজোড় হলে চলবে না, বিজোড় হলেই ভগ্নাংশ সংখ্যা চলে আসবে। কিন্তু নাইট্রোজেনে ইলেকট্রন আর প্রোটন মিলিয়ে মোট ২১ (১৪ প্রোটন + ৭ ইলেকট্রন)টি। তাই সবগুলো যোগ করার পর দেখা যাবে একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।

তখন বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে রাধারফোর্ড পড়লেন গভীর সমস্যায়!

(চতুর্থ পর্ব)

তাহলে যে হাইপোথিসিসে এতসব সমস্যা সেটা রেখে লাভ কী? তার থেকে বরং এমন এক কণার কথা ভাবা যেতে পারে যার চার্জ নেই, কিন্তু ভর প্রোটনের সমান। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে রাদারফোর্ড প্রোটন-ইলেকট্রন হাইপোথিসিসের পর কেটে গেল অনেকগুলো বছর। কিন্তু নিউক্লিয়াসের সমস্যাটার আর সমাধান হলো না। এরা যেন কাঁটাবিহীন ওই ল্যাঠা মাছগুলোর মতো কাঁটা মানে চার্জ নেই বলে জালে আটকানো কঠিন। তাই আপনাকে এখন নতুন জাল, আলাদা কোনো যন্ত্র অথবা অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে!!

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী **ওয়ালথার বোথে** আর তাঁর ছাত্র নতুন জালটা পাতার ব্যাপারে অনেকদূর এগিয়ে গেলেন। তাঁরা রাদারফোর্ডের করা পুরোনো একটি পরীক্ষা নতুন করে করলেন। আলফা কণা দিয়ে আঘাত করলেন বেরিলিয়াম পরমাণুকে। এর উদ্দেশ্য ছিল আগে গামা রশ্মির সন্ধান করা। সত্যি সত্যি এই পরীক্ষায় তারা গামা রশ্মির সন্ধান পেলেন। এই রশ্মি ভেদনক্ষমতা খুব বেশি। কেন বেশি, তাহলে এতে কি সেই চার্জ নিরক্ষেপ কণাটি রয়েছে, ঠিক যেমনটি ইলেকট্রন থাকে বিটা রশ্মিতে আর প্রোটন থাকে আলফা রশ্মিতে। আলফা বা বিটা, কোনো রশ্মিই অতটা উচ্চ ভেদনক্ষমতাসম্পন্ন নয়, কারণ ট্যাংরা-কইয়ের মতো এদের পিঠে ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক চার্জ আছে, তাই এদের অন্য বস্তুর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া জড়ানোর প্রবণতা অনেক বেশি। কিন্তু গামা রশ্মির ভেদনক্ষমতা খুব বেশি, কারণ হয়তো এর ভেতর ল্যাঠা মাছের মতো কাটাবিহীন অর্থাৎ চার্জহীন কোনো কণা আছে। এর চার্জ নিরপেক্ষ বলে সহজে অন্য বস্তুর সঙ্গে

মিথস্ক্রিয়ার জড়ায় না, তাই সহজেই অন্য পদার্থকে ভেদ করে বেরিয়ে যেতে। শুধু তাই-নয়, তাঁরা আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন, গামা রশ্মির শক্তি অনেক বেশি। চাইলে এই রশ্মি দিয়ে আঘাত করে পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ভেঙে ফেলা যেতে পারে!

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বোথে আর বেকার তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করলেন। ততদিনে দৃশ্যপট হাজির, কুরি দম্পত্তি – ফ্রেডিরক ও আইরিন জুলিয়ট কুরি। তারা এই গামা রশ্মি নিয়ে কাজ শুরু করলেন **১৯৩১** খ্রিস্টাব্দে। তাঁরা একটা তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়ামের উৎস ব্যবহার করলেন, এ থেকে নির্গত হয় বোথের গামা রশ্মি। বোথের দেখানো পথেই তিনি এই গামা রশ্মি দিয়ে আঘাত করলেন প্যারাফিন মোমকে। তাঁরা নিশ্চিত হলেন, এই আঘাতের ফলে প্যারাফিন মোমে থাকা হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস থেকে প্রোটন মুক্ত হয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসছে মোম থেকে।

এত সুন্দর একটা পরীক্ষা কররেন কুরি দম্পতি, কিন্তু তুলির শেষ আঁচড়টা টানতে পারলেন না। তারা বুঝলেন না, এই ধরনের একটা পরীক্ষা দিয়ে আধান নিরপেক্ষ কণাটিও নিউক্লিয়াস থেকে বের করে আনা যেত। পারলেন না সেই কাঁটাবিহীন ল্যাঠা মাছ অর্থাৎ নিউট্রনকে জালে ধরতে! একটুর জন্য জাল থেকে তা ছিটকে বেরিয়ে গেল।

(পঞ্চম পর্ব)

আগের পর্বে বলেছি এত সুন্দর একটা পরীক্ষা করলেন কুরি দম্পতি, কিন্তু তুলির শেষ আঁচড়টা দিতে পারলেন না। জোলিও কুরি দম্পতি দেখেছিলেন বেরিয়ামকে আলফা কণা দিয়ে ধাক্কা মারলে এক আধানহীন রশ্মি বের হয়। এই রশ্মি প্রোটনকে আঘাত করলে প্রোটনের বেগ হয়ে দাঁড়ায় প্রতি সেকেন্ড **১৫০০০** কিলোমিটারেরও বেশি। জোলিও কুরিরা মনে করেছিলেন এ অদৃশ্য রশ্মি হল গামা রশ্মি, যার কথা আগেই বলেছি। গামা রশ্মির কণা হল ফোটন। তার কোনো আধান নেই।

রাদারফোর্ড যখন এই পরীক্ষার কথা শুনলেন, তিনি সরাসরি বললেন, "আমি এতে বিশ্বাস করি না। তার কারণও আছে। ধরা যাক একটা ফুটবলকে একটা টেবিল টেনিস বল দিয়ে খুব জোরে ধাক্কা মারলাম। তাহলে ফুটবলটা যত জোরে সরে যাবে, তার চেয়ে অনেক জোরে সরবে অন্য একটা ফুটবল দিয়ে আস্তে ধাক্কা মারলে। আলোর কণা ফোটনের স্থির ভর শূন্য – তা দিয়ে প্রোটনকে অত জোরে ধাক্কা মারতে গেলে তার শক্তি খুব বেশি হতে হবে।"

ব্যাপারটা বুঝলেন রাদারফোর্ডের ছাত্র ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **জেমস চ্যাডউইক**। তিনি গামা রশ্মি দিয়ে শুধু হাইড্রোজেন নয়, বেরিলিয়াম আর নাইট্রোজেন পরমাণুকেও আঘাত করলেন। দেখলেন বোথের হিসাব মতো বেরিলিয়াম আর নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াসকেও গুড়িয়ে দিচ্ছে গামা রশ্মি। সেখান থেকে নির্গত কণিকাগুলোর গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখলেন নিউক্লিয়াস থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা কণার মতো চার্জহীন কিন্তু প্রোটনের ভরের কাছাকাছি ভরের কণাও রয়েছে। সম্ভবত বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াস থেকে নিউট্রন কণা বেরিয়ে প্রোটনকে ধাক্কা মারছে। নিউট্রনেরও আধান নেই, তাই তাকে গামা রশ্মির সঙ্গে জোলিও কুরিরা গুলিয়ে ফেলেছিলেন।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। মাত্র দুই সপ্তাহের একটি সফল গবেষণার পর চ্যাডউইক একটি পেপার প্রকাশ করেন "The Possible Existence of a Neutron", যাতে তিনি প্রস্তাব করেন পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকে ছিটকে আসা কণাগুলো নিস্তড়িত নিউট্রন কণা। তা গামা রশ্মি বা ফোটন নয়। এর কয়েক মাস পর **১৯৩২** খ্রিস্টাব্দের মে মাসে "The Existence of a Neutron" নামে এক গুরুত্বপূর্ণ পেপার নেচার পত্রিকায় প্রকাশ করেন। আবিষ্কার হলো নিউট্রন। আরও কয়েক মাস পর তিনি আরেকটি প্রবন্ধ লিখে নিউট্রন কণা সনাক্তের ঘোষণা ও ব্যাখ্যা দেন।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই নতুন আবিষ্কৃত নিউট্রন কণাকে পরমাণুর একটি মৌলিক কণা বলে উল্লেখ করেন। এই বছর আরও ব্যাপক গবেষণার পর প্রমাণিত হয়, নিউট্রন প্রোটন – ইলেকট্রনের সমন্বয়ে গঠিত কোনো কণা নয়; বরং তা একটি মৌলিক কণা।

এভাবেই চ্যাডউইক পরীক্ষা করে পরমাণুর কেন্দ্রকে নিস্তড়িত কণা আছে প্রমাণ করলেন। এই কণাটির নামকরণ করা হলো নিউট্রন নামে। শব্দটা এসেছে নিরপেক্ষ অর্থাৎ নিউট্রাল থেকে। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য **১৯৩৫** খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিনি। নিউক্লিয়াসের ষোলকলা পূর্ণ হলো বলে মনে করলেন পদার্থবিজ্ঞানীরা। তবে আরো পরে জানা যায় যে নিউট্রন মৌলিক নয়, বরং কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি। তবে এই নিউট্রন আবিষ্কার ছিল কণাপদার্থবিদ্যার জগতের ট্রেলার!! পুরো সিনেমাটাই এখন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার দখলে! ■

অতিথি কলম ঃ

ইনসুলিন আবিষ্কারের শতবর্ষ – স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ

– সাম্যজিৎ গাঙ্গুলি
(কলকাতা মেডিকেল কলেজ)

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে মিশরবিদ গিয়র্গ এবার্স প্রকাশ করলে থিবসের কাছেই এক গুহা থেকে উদ্ধার হওয়া এক প্যাপিরাস পান্ডুলিপি। ১৫৫০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ নাগাদ লেখা প্যাপিরাসটির মূল বিষয় চিকিৎসাশাস্ত্র। বর্ণনা রয়েছে সেযুগের নানান অসুখের। তালিকায় আধুনিক সময়ের এক অতি পরিচিত অসুখও ছিল – মধুমেহ বা ডায়াবেটিস। অতিরিক্ত তৃষ্ণা, বারংবার মূত্রত্যাগ ও দ্রুত ওজন হ্রাস – লক্ষণ অতি পরিচিত। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পেরিয়েও ১৮৭৪-এও একইরকম অমোঘ, নির্মম মৃত্যুদূত। 'সাক্ষাৎ মৃত্যু পরোয়ানা' থেকে 'আরেকটা কষ্টদায়ক অসুখ' হয়ে যেতে ডায়াবেটিসের লেগেছিল আরো প্রায় ৫০ বছর – টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে যখন প্রথম আবিষ্কৃত হচ্ছে ইনসুলিন, সেটা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ। আজ থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে পাকাপাকিভাবে পাল্টে গেছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস।

মদুমেহ বা ডায়াবেটিস মেলিটাস মূলত একটি এন্ডোক্রিন অসুখ। অগ্ন্যাময় বা প্যানক্রিয়াসের Islets of Langerhans-এর বিটা কোষ থেকে নির্গত হয় ইনসুলিন। এই ইনসুলিনের মূল কাজ হলো দেহের অন্য কোষে গ্লুকোজের প্রবেশ ঘটাতে সাহায্য করা। দেহের প্রত্যেকটি কোষেই শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস হলো গ্লুকোজ। কোষে সেই গ্লুকোজের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হয় ইনসুলিনের মাধ্যমে। দেহে ইনসুলিনের অভাব হলে বা কোষের গায়ে লেগে থাকা ইনসুলিন রিসেপ্টর বিকল হয়ে গেলে তাই গ্লুকোজ আর প্রবেশ করতে পারে না কোষের মধ্যে। রক্তে বাড়তে থাকে শর্করার মাত্রা। লক্ষণ হিসেবে দেখা দেয় অতিরিক্ত তেষ্টা, বারংবার প্রস্রাব, দ্রুত কমে যায় ওজন। ক্ষতি হতে থাকে চোখ, কিডনি, লিভার, হার্টের মতো বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের। কমতে থাকে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। মানুষ দ্রুত এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে।

মূলত দুভাগে ভাগ করা যায় ডায়াবেটিসকে – টাইপ ১ ও ২। টাইপ ১ ডায়াবেটিস-এর কারণ মূলত ইনসুলিনের অভাব। এ রোগের সূত্রপাত ঘটে খুবই অল্প বয়সে, এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা না পেলে রোগী বেশি দিন বাঁচে না। টাইপ ২ ডায়াবেটিস সাধারণত হয় তুলনামূলক বেশি বয়সে, সচরাচর জীবনের চতুর্থ দশক বা তারপরে। এক্ষেত্রে দেহে ইনসুলিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও সেই ইনসুলিন কার্যকরী হয় না অতটাও। কোষের গায়ে লেগে থাকা ইনসুলিন রিসেপ্টর বিকল হয়ে যাবার দরুন টাইপ ২ ডায়াবেটিস দেখা যায়। এক্ষেত্রে রোগের তীব্রতা টাইপ ১-এর তুলনায় খানিকটা কম, সময়মতো চিকিৎসা পেলে রোগীকে মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন উপহার দেওয়া যায় বেশ সহজেই। দুই ধরণের ডায়াবেটিস মেলিটাসের চিকিৎসার জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে ইনসুলিনের। টাইপ ১-এর ক্ষেত্রে বাইরে থেকে ইনসুলিনের যোগান দেওয়া একান্তই জরুরি, কারণ দেহে ইনসুলিন তৈরির প্রক্রিয়াটিই ব্যাহত হয়েছে। টাইপ ২-এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহৃত হলেও ইনসুলিনই শেষ ভরসা – দেহে ইনসুলিনের পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে দিয়ে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সকে অতিক্রম করার চেষ্টা চলে। আজ থেকে ১০০ বছর আগে, যখন **ব্যানটিং** ও **বেস্ট** ইনসুলিন আবিষ্কার করে ওঠেননি, তাই ডায়াবেটিস ছিল নিশ্চিত মৃত্যু। আজ সময়, সেই আবিষ্কারকে, এবং সেই আবিষ্কার-পরবর্তী সময়টিকে আরেকবার ফিরে দেখা।

মেমফিসের এপলোনিয়াস প্রথম 'ডায়াবেটিস' নামটা ব্যবহার করেন খ্রিস্টপূর্বাব্দ ২৩০ নাগাদ। এরপর সেলসাস, এরিটাস, গ্যালেন, চরক, সুশ্রুত – আদিযুগের বহু চিকিৎসকই কাজ করেছেন ডায়াবেটিস নিয়ে। ডায়াবেটিস মেলিটাস এবং ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (বা বহুমূত্র)'র ফারাক স্পষ্ট হয়েছে, টাইপ ১ ও ২ ডায়াবেটিস মেলিটাসের লক্ষণের ফারাকও বোঝা গেছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক অবধি চিকিৎসকদের বিশ্বাস ছিল ডায়াবেটিস একটি কিডনির অসুখ। ধারণা পাল্টে দিলেন ব্রিটিশ চিকিৎসক **ম্যাথু ডবসন**। প্রমাণ করলেন ডায়াবেটিস মেলিটাসে শুধু মূত্রে নয়, রক্তেও বৃদ্ধি পায় শর্করার মাত্রা। প্রায় ১০০ বছর আগে আরেক ব্রিটিশ চিকিৎসক **টমাস উইলিস** দাবি করেছিলেন ডায়াবেটিস কিডনির নয়, রক্তের অসুখ। ডবসনের গবেষণা সেই দাবির স্বপক্ষে প্রথম প্রমাণের যোগান দিলো। ১৭৮৮-তে আরেকটি চমকপ্রদ আবিষ্কার করলেন **টমাস কউলি**। শবব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে দেখলেন মৃত্যুর আগে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বহু ব্যক্তিরই প্যানক্রিয়াস

ক্ষতিগ্রস্ত। প্যানক্রিয়াসের সঙ্গে ডায়াবেটিসের সম্পর্কের কথা প্রথমবার উত্থাপিত হলো কোনো বৈজ্ঞানিক চর্চায়। কিংবদন্তি ফরাসি চিকিৎসক **ক্লড বার্নার্ড** আরেকটা চমকপ্রদ আবিষ্কার করলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। প্যানক্রিয়াস থেকে যে নালির মাধ্যমে বিভিন্ন এনজাইম নির্গত হয়, সেই নালি যদি বন্ধ করে দেওয়া যায় তবে প্যানক্রিয়াসের এনজাইম উৎপাদনকারী অংশও ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এমনটাও দেখতে পেলেন বার্নার্ড। আপাত দৃষ্টিতে এর সঙ্গে হয়তো কোনো সম্পর্কই নেই ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়। তবুও, এই আবিষ্কারই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় পরে ইনসুলিন তৈরির সময়। এর কাছাকাছি সময়েই **উইলিয়াম প্রাউট, উইলহেলম পিটার্স** ও **এডলফ কুশমল** বিস্তারিত গবেষণা করে ডায়াবেটিক কোমা নিয়ে, হেনরি নয়েস প্রথমবারের জন্য বর্ণনা দেন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির। ডায়াবেটিস মেলিটাস নামটা দেন **জন রোলো**, ব্রিটিশ আর্মির সার্জেন জেনারেল। মেলিটাস অর্থাৎ এক্ষেত্রে মূত্রের স্বাদ মিষ্টি, বহুমূত্র বা ইনসিপিডাসের মূত্র বিস্বাদ। রোলো বেশ কিছু অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করতে থাকেন ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়। প্রোটিন-পূর্ণ ও সীমিত শর্করায় ডায়াবেটিক ডায়েটের প্রথম পরিকল্পনা তাঁরই। **ফ্রেডরিক অ্যালেন** রোলোর তত্ত্বেরই বিকাশ ঘটানা তাঁর 'স্টারভেশন ডায়েট'-এ। টাইপ ১ ডায়াবেটিসের খুব একটা কাজে না এলেও, টাইপ ২-এ যথেষ্টই কার্যকরী হয় এই সীমিত ক্যালোরির ডায়েট। স্ট্রাসবুর্গে বার্নার্ড নাউনিনের অধীনে কাজ করছিলেন **অস্কার মিনকস্কি** ও **জোসেফ ভন মেরিং**। তাঁদের হাত ধরেই প্রথমবার সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে **ডায়াবেটিস আদতে একটি প্যানক্রিয়াসের অসুখ,** ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। সুস্থ কুকুরের শরীর থেকে প্যানক্রিয়াস কেটে বাদ দিলে তার দেহে দেখা দেয় ডায়াবেটিসের লক্ষণ – মিনকস্কি ও মেরিংয়ের আবিষ্কারের পিছনে প্রাথমিক অবজার্ভেশন ছিল এটাই। দুবছরের মধ্যে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন ফরাসি শল্যচিকিৎসক **এডুয়ার্ড হেডন**। প্যানক্রিয়াস সম্পূর্ণভাবে কেটে বাদ না দিলে, বা কেটে বাদ দেবার পরও প্যানক্রিয়াস চামড়ার তলায় প্রতিস্থাপন করলে ডায়াবেটিসের লক্ষণ দেখা যায় না, দেখলেন হেডন। অর্থাৎ প্যানক্রিয়াসের এক্সোক্রিন গ্ল্যান্ড-এ নয়, সাধারণ অঙ্গটিতেই লুকিয়ে রয়েছে ডায়াবেটিসের মূল কারণ। একই ফলাফল পৃথক গবেষণায় পেলেন মিনকস্কিও। **গুস্তাভ-এডুয়ার্ড ল্যাগেসে** দাবি করলেন Islets of Langerhans-এ লুকিয়ে আছে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রার আসল নিয়ন্ত্রক। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জঁ দ্য মেয়ার এই বস্তুটিরই নাম দিলেন ইনসুলিন। কুকুরের প্যানক্রিয়াস থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে **গেওর্গ লুডউইগ জুলজার** তৈরি করলেন 'acomatol'। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে acomatol ব্যবহার করে ডায়াবেটিক কোমা থেকে এক রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হলো, কিন্তু সঙ্গে দেখা দিল আরও বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। পরে আরও একবার প্যানক্রিয়াসের রস থেকে ডায়াবেটিসের ওষুধ তৈরিরর প্রচেষ্টা করেন জুলজার, হফম্যান-লা রোমে কোম্পানির জন্য। এবারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যায় খিঁচুনি, সম্ভবত রক্তে শর্করার মাত্রা অতিরিক্ত কমে যাবার ফলে। রোমানিয়ার **নিকোলা কনস্ট্যান্টিন পাউলেস্কো** আজ ডায়াবেটিস গবেষণায় প্রায় উপেক্ষিত এক নাম। কিন্তু তিনিও প্রস্তুত করেন এক প্যানক্রিয়াটিক এক্সট্র্যাক্ট, নাম Pancrein। এক ডায়াবেটিস আক্রান্ত কুকুরের শরীরে pancrein প্রয়োগ করা হলে কুকুরটি মারা যায় রক্তের শর্করার মাত্রা এক ধাক্কায় অতিরিক্ত কমে যাবার দরুন। হয়তো ইনসুলিনের সন্ধানও পেয়ে যেতেন পাউলেস্কো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঁধা হয়ে না দাঁড়ালে।

অগাস্ট ৩১, ১৯২০। **ফ্রেড ব্যানটিং** সদ্য যুদ্ধ ফেরত তরুণ (ও তখন অবধি অসফল) অর্থোপেডিক সার্জেন। চাকরি করেন ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অন্টারিও'তে, ফিজিওলজির ডেমনস্ট্রেটর পদে। তখনই তাঁর উৎসাহ জন্মায় ডায়াবেটিসের প্রতি। ক্লড বার্নার্ড বর্ণিত পদ্ধতিতে প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন প্রস্তুত করার পরিকল্পনা তখনই। অন্তত তেমনটাই বলছে সেই ৩১শে অগাস্টে তাঁর ব্যক্তিগত ডায়রিতে লেখা একটি নোট। টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন ম্যাকলিওডের কাছে যখনপ্রস্তাবটি পাড়েন ব্যানটিং, তখন তরুণটিকে খুব একটা ভরসাযোগ্য মনে হয়নি অভিজ্ঞ অধ্যাপক **ম্যাকলিওডের**। তাও ব্যানটিংকে তিনি জায়গা করে দেন তাঁর ল্যাবে কাজ করার জন্য, ১৯২১-এর গ্রীষ্মে। হাতে সময় দেওয়া হয় ৮ সপ্তাহ। ম্যাকলিওড সঙ্গে এক সহকারিও জুড়ে দেন। ফিজিওলজি বিভাগের ছাত্র চার্লস বেস্ট। জুলাই ১৯২১-এ প্রথম ইনসুলিন তৈরি হয় কুকুরের প্যানক্রিয়াস থেকে। কুকুরের উপরই প্রথম প্রয়োগে কাজ হবার পর ইনসুলিন তৈরি করা হয় গর্ভস্থ বাদুরের ভ্রূণ ও পূর্ণবয়স্ক গরু থেকেও। ব্যানটিংদের গবেষণার প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৪ নভেম্বর, ১৯২১-এ। ফিজিওলজিক্যাল জার্নাল ক্লাব অফ টরোন্টো'তে। বছরের শেষদিকে গবেষণার দলে যোগ দেন জৈবরসায়নবিদ **জেমস কলিপ**। ব্যানটিং ও বেস্টের তৈরি ইনসুলিনকে শোধন ক'রে ব্যবহারযোগ্য ক'রে তোলাটা সম্ভব হতো না তাঁকে ছাড়া। ১৪ বছর বয়সী টাইপ ১ ডায়াবেটিসের রোগী লেনার্ড থমসন ভর্তি তখন টরেন্টো জেনারেল

হাসপাতালে। প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরটির ওজন কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে মোটে ৬৪ পাউন্ড। ১১ জানুয়ারি, ১৯২২ প্রথম ইনসুলিন ইনজেকশন পেলেন লেনার্ড। খুব একটা কার্যকরী হলো না ব্যানটিংদের গবেষণার ফসলটি। উল্টে ইঞ্জেকশন দেবার জায়গায় অ্যাবসেস হয়ে গিয়ে সংকট আরো বেড়ে গেল। ১২ দিন পর, ২৩শে জানুয়ারি, আবার আরেকটা ইনজেকশন দেওয়া হলো লেনার্ডকে। এবারের ইনসুলিনটি আরো শোধন করলেন কলিপ। কাজ হলো ম্যাজিকের মতো। এক দিনের মধ্যে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নেমে গেল ৫২০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার থেকে ১২০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারে। প্রস্রাবের সঙ্গে কিটোন বডি বেরোনো বন্ধ হয়ে গেল পুরোপুরি। পাল্টে গেল চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস।

ম্যাকলিওড-ব্যানটিং-বেস্ট-কলিপের এই আবিষ্কারের ইতিহাস ভীষণরকম আকর্ষণীয়, ক্ষেত্রবিশেষে রোমাঞ্চকরও বটে। বিজ্ঞানচর্চার পথে বাধা, বিজ্ঞানীদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সব ছাপিয়ে মানুষের অতিমানব হয়ে ওঠা – ইনসুলিন আবিষ্কারের কাহিনী কোনো অংশে কম নয় থ্রিলারের চেয়ে। এমনকি ১৯২৩-এ ইনসুলিন আবিষ্কারের জন্য দেওয়া নোবেল প্রাইজটিও তো বিতর্কিত। পুরস্কার পেয়েছিলেন কেবল ম্যাকলিওড আর ব্যানটিং। বঞ্চিত হওয়া বেস্ট ও কলিপের সঙ্গে যদিও নিজেদের পুরস্কারমূল্য ভাগ করে নিয়েছিলেন দুজনে। তবে ব্যানটিং তাতেও খুশি ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল ম্যাকলিওড আর যাই হোক নোবেল পাবার মতো কিছু করেননি। এসব বিষয়ে কাজ হয়েছে প্রচুর, তথ্যও খুব দুর্লভ নয়। তাই সে আলোচনায় ঢুকছি না আর। বরং একটু অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলা যাক। ইনসুলিনের স্বাস্থ্য-অর্থনীতির সেকাল ও একাল।

ইনসুলিনের প্রস্তুতিপর্বেই একটা বড় প্রশ্ন হয়ে ওঠে এর অর্থনৈতিক দিক। পেটেন্ট বিষয়টির গুরুত্ব ঠিক কতখানি, তা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব থাকবে তা সহজেই অনুমেয়। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনসুলিন তৈরি হলেও তা নেহাতই গবেষণামূলক, পরিমাণ সীমিত। তাই শঙ্কার বিষয়, যদি অন্য কেউ টরন্টোর আগেই বৃহৎ আকারে ইনসুলিন উৎপাদন আরম্ভ করে দেয়। ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাদের নজর রয়েছে অনেক দিনই। এলি লিলির অন্যতম পদাধিকারী জর্জ হেনরি ক্লোউজ ম্যাকলিওডকে চিঠিতে বারংবার অনুরোধ করছেন তাঁদের সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে, যাতে ইনসুলিন উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। সঙ্গে ইঙ্গিত করছেন, দরকার পড়লে টরেন্টোকে এড়িয়ে তার কোম্পানিও কাজ শুরু করতে পারে ইনসুলিন নিয়ে। জবাবে ম্যাকলিওড লিখলেন সাহায্য যদি নিতে হয় তো তাঁরা প্রথমে এলি লিলির থেকেই নেবেন, কিন্তু আপাতত মাস দুয়েক তাঁরা নিজেরাই কাজ করে দেখতে চান। তাঁরা আশা রাখেন ইনসুলিনকে সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার এবং তার মান নিয়ন্ত্রণ করার। সামনে এ কথা বললেও ম্যাকলিওড নিজে এ ব্যাপারে বিশেষ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না। অন্য সংস্থা, বিশেষত ওষুধ কোম্পানিকে নিয়ে ভীতি ছিল ভালো মতোই। থায়রক্সিনের আবিষ্কর্তা ইসি কেন্ডাল এর আগে থায়রক্সিনের পেটেন্ট বানিয়ে তারপর তা তুলে দিয়েছিলেন মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি স্পেশাল কমিটির দায়িত্ব ছিল থায়রক্সিনের প্রস্তুতি ও মান নিয়ন্ত্রণ করা। সেই একই পরামর্শ তিনি দিলেন ম্যাকলিওডকে। কিন্তু দুই চিকিৎসক ব্যানটিং ও ম্যাকলিওডের চূড়ান্ত আপত্তি এরকম একটি জীবনদায়ী ওষুধের পেটেন্ট করাতে। তবুও, পেটেন্ট হলো। চার্লস বেস্ট ও জেমস কলিপের নামে। যা পরে তুলে দেওয়া হবে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। মূল লক্ষ্য অন্য কাউকে, বিশেষত কোনো ব্যবসায়িক সংস্থাকে ইনসুলিন পেটেন্ট করা থেকে আটকানো। যাতে কোনোভাবেই কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া পণ্য না হয়ে যায় ইনসুলিন।

The patent would not be used for any other purpose than to prevent the taking out of a patent by other persons. When the details of the method of preparation are published anyone would be free to prepare the extract, but no one could secure a profitable monopoly.

(টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট স্যার রবার্ট ফ্যালকনারকে লেখা ইনসুলিন গবেষকদের চিঠির অংশ।)

তবে টরন্টোর গবেষকদের পিছনে লেগে থাকার সুফল পেয়েছিলেন ক্লোউজ। একদিকে ক্রমবর্ধমান ইনসুলিনের চাহিদা, উল্টোদিকে বিপুল পরিমাণে ইনসুলিন প্রস্তুত করার অক্ষমতা – চাপ বাড়তে থাকে টরেন্টোর দলের উপরে। এই বাড়তি চাহিদা যোগান দেবার জন্য এগিয়ে এলো এলি লিলি। ইনসুলিনের পেটেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের হাতে। তাদের অধিকার কোনো কোম্পানিকে ইনসুলিন প্রস্তুতির লাইসেন্স দেবার। এক বছরের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইনসুলিন তৈরির একমাত্র লাইসেন্স দেওয়া হলো এলি লিলিকে। চুক্তি অনুযায়ী এলি লিলির হাতে অধিকার রইলো যা কিছু নতুন উন্নতি ঘটানো হবে ইনসুলিন তৈরির পদ্ধতিতে, তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট নিজেদের হাতে রাখার। বাকি পেটেন্ট

ভাগ করে নিতে হবে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। ব্রিটেন তথা ইউরোপের পেটেন্ট তুলে দেওয়া হলো ব্রিটিশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের হাতে। এই এক বছরের জন্য একচেটিয়া অধিকারও বেশ খানিকটা সুবিধা করে দেয় এলি লিলিকে। প্রথম বছরেই প্রায় এক মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে কোম্পানি। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাদের।

ইনসুলিনের পেটেন্টের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা আশা করতেই পারেন যে আজ ইনসুলিন সহজলভ্য হবে, পৃথিবীব্যাপী বহু ডায়াবেটিস রোগী তাঁদের অসুখের চিকিৎসা পাবেন সামান্য খরচে। কিন্তু অভিজ্ঞ পাঠক এটাও জানেন যে বাস্তব পুরোপুরি উল্টো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যানাল্স অফ ইন্টারনাল মেডিসিন-এর গবেষণায় প্রকাশ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ১৩ লক্ষ ডায়াবেটিস রোগী অর্থের অভাবে হয় ইনসুলিন নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন, নয়তো পর্যাপ্ত ডোজের থেকে কম নিচ্ছেন। এক দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইনসুলিনের দাম বেড়েছে প্রায় তিনগুণ। কিন্তু কেন? যে ওষুধের পেটেন্ট করার সময় মূল লক্ষ্যই ছিল এরকম অবস্থা আটকানো, তার এই হাল হলো কী করে? এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল ইনডাস্ট্রির খানিকটা কাদা ঘাটতে হবে। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনসুলিন তৈরি হবার পরে উন্নততর ইনসুলিন তৈরির প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি। বিভিন্ন সংস্থা নতুন ইনসুলিন তৈরি করেছে। কিছু ক্ষেত্রে, যেমন প্রোটামাইন জিঙ্ক ইনসুলিন, পেটেন্ট আবারও তুলে দেওয়া হয়েছে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে ব্যাপারটা মোটেই তেমন না। প্রতিটি নতুন, উন্নত অবতারেই ইনসুলিন আরো পেটেন্টের বেষ্টনীতে বাঁধা। নতুন ইনসুলিন কিছু ক্ষেত্রে সত্যিই উন্নত, কিছু সময় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পুরোনো ইনসুলিনের সমতুল্যই। এই তথাকথিত 'উন্নত' ইনসুলিন বাজারে নিয়ে আসার দুটি ফল হয় – এক, কোম্পানি তার পেটেন্ট, এবং একচেটিয়া অধিকার, বজায় রাখে। দুই, পুরোনো ইনসুলিনের পেটেন্ট ফুরিয়ে গেলেও জেনেরিক ড্রাগ নির্মাতারা আর সেই ইনসুলিন তৈরি করতে রাজি হন না, কারণ বহু চিকিৎসকের কাছেই এই পুরোনো ইনসুলিন 'অবসোলিট'। কিছু ক্ষেত্রে, যেমন এলি লিলির ইনসুলিনে, মূল ইনসুলিন দ্রব্যটি পেটেন্টের অধীনে নয়। কিন্তু ইসুলিন প্রস্তুত করার বিভিন্ন পদ্ধতিকেই পেটেন্টের আওতায় এনে অন্য প্রস্তুতকারী সংস্থাকে আটকানো হয়েছে ইনসুলিন তৈরি থেকে। অতএব, ইনসুলিনের বাজার থাকে পুরোপুরি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার হাতে। তাই দাম বাড়ানো যায় চড়চড়িয়ে। ইউরোপের বহু দেশে যেখানে সবার জন্য স্বাস্থ্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সেখানে দাম নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ভূমিকা থাকে খানিকটা, কিন্তু আমেরিকা বা ভারতের মতো দেশে ব্যাপারটা একদমই খোলা বাজারে। টাইপ ১ ডায়াবেটিস-আক্রান্তের ইনসুলিনের পিছনেই খরচ, ভারতবর্ষে, গড়ে মাসে ১০-১২ হাজার টাকা। এটা স্রেফ ইনসুলিনের খরচ, আনুসঙ্গিক খরচ বাদে। (ডায়াবেটিস আক্রান্তের পরিবারের সদস্য হবার দরুণ স্বচক্ষে দেখেছি এই খরচ ঠিক কতটা বাড়তে পারে।)

ইনসুলিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)'র নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধের (এসেন্সিয়াল মেডিসিন্স) তালিকাভুক্ত। নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, হতে হবে গুণমান পরীক্ষিত, সহজলভ্য, এবং সাধারণ মানুষের অর্থসাধ্য। ইনসুলিনের এবং আরো অনেক ওষুধের ক্ষেত্রেই অবশ্য ড্রাগ কোম্পানিরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে যে হু'র নির্দেশকে তারা পাত্তা দেবে না। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের, এবং কল্যাণকারী রাষ্ট্রের করণীয় কী তবে? আমরা যারা স্বাস্থ্যের অধিকারের দাবি করি, তারা সহজেই বলতে পারি যে সরকার নিয়ন্ত্রণ করলেই আর ওষুধের দাম এত দ্রুত বাড়ে না। কথাটা সত্য, তবে পুরোপুরি নয়। যতদিন অবধি ইনসুলিনের স্বত্ব থাকবে বেসরকারি সংস্থার হাতে, ততদিন সরকার যতই দরাদরি করুক, ইনসুলিনের দাম বাড়বে। একই জিনিস শুধু ইনসুলিন নয়, চলবে অন্য জীবনদায়ী ওষুধের ক্ষেত্রেও। কোম্পানি স্বত্বাধিকার নিয়ে একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি করলে সরকার কিনতে বাধ্য। ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে ওষুধ প্রস্তুত করার উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ভাঙাটা জরুরি সবার আগে। প্রাথমিকভাবে অবশ্যই দরকার সরকারি ব্যবস্থায় জেনেরিক ওষুধ তৈরি করার। বাজারে যোগান না বাড়লে দাম কোনোমতেই কমবে না। সঙ্গে অবশ্যই, প্রশ্ন তোলা দরকার জীবনদায়ী ওষুধের ক্ষেত্রে ড্রাগ পেটেন্টের ও এক্সক্লুসিভ লাইসেন্সের বৈধতা নিয়েও। নয়তো পেটেন্টের ছুঁতোয় বেশ কিছু ওষুধ থেকে যাবে সাধারণের নাগালের বাইরেই। বৌদ্ধিক সম্পত্তির প্রতি কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার অধিকার কি কোনোদিনও বেঁচে থাকার অধিকারের থেকেও বড় হতে পারে? বৃহৎ পুঁজির একাধিপত্য ভাঙতে গেলে জীবনদায়ী ওষুধের স্বত্বাধিকারের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা তাই ভীষণ প্রয়োজন। ■

বিজ্ঞানের খবর

সেপ্টেম্বর ১ ঃ ◈এই প্রথম কোনো বহির্গ্রহের ছবি সরাসরি তুলতে সক্ষম হল জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ। বৃহস্পতি গ্রহের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ আয়তন বিশিষ্ট এই গ্রহটি পৃথিবী থেকে ৩৮৫ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এইচ আই পি ৬৫৪২৬ বি নামক বহির্গ্রহটির অস্তিত্ব ও অবস্থান ২০১৭ সালে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন তাপ-নির্গমন বা থারমাল এমিসন প্রযুক্তির সাহায্যে। এতদিন অনেক বহির্গ্রহ'র অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু সরাসরি ছবি তোলা সম্ভব হল এই প্রথম। (দ্য গার্ডিয়ান)

◈স্নায়ুবিজ্ঞানীরা এক নতুন ধরনের প্রান্তসন্নিকর্ষ বা সাইন্যাপসের সন্ধান পেয়েছেন। এই নতুন ধরনের সাইন্যাপস হল অ্যাক্সন ও এক ধরনের সিলিয়ার অন্তর্বর্তী অঞ্চল। সেরোটনিন নামক নিউরোট্রান্সমিটারের সাহায্যে যা স্নায়বিক সংবেদন আদান-প্রদান করে থাকে। ইঁদুরের মস্তিষ্কে এই ধরনের সাইন্যাপসের সন্ধান পেয়েছেন ভার্জিনিয়ার জেনেলিয়া গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। এই আবিষ্কার স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকর্মের বর্তমান ধারণার পরিবর্তন ঘটাতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। (সেল)

সেপ্টেম্বর ৬ ঃ ◈মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি মন্ত্রক বেগুনী টম্যাটো'র বীজ ক্রয় ও চাষের আইনী স্বীকৃতি দিয়েছে। এই বিশেষ ধরনের টম্যাটো প্রস্তুতিতে জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রস্তুতকারক সংস্থা নরফক প্ল্যান্ট সায়েন্স-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই টম্যাটোতে অ্যানথোসায়ানিন নামক একটি রঞ্জক পদার্থ রয়েছে আর আছে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ক্যান্সার প্রতিরোধক ও হৃদপিন্ডের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে কার্যকরী। (মার্কিন কৃষি বিভাগ, ইউএসডিএ)

সেপ্টেম্বর ৭ ঃ ◈বৃটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটি ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক (আর২ ১) প্রস্তুত করেছেন যার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রায় ৮০ শতাংশ। একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে মশারী, কীটনাশক, ভেষজ ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার সত্ত্বেও সারা বিশ্বে প্রতিবছর ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ২২.৯ কোটি যার ৯৪ শতাংশই আফ্রিকা মহাদেশে। প্রতি বছর সারা বিশ্বের ম্যালেরিয়ায় ৪ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই প্রতিষেধক খুব সস্তায় মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া সম্ভব বলে জানানো হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। প্রতিষেধক প্রস্তুতকারী সংস্থা সেরাম ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়া এই প্রতিষধক প্রস্তুত করার আগ্রহ প্রকাশ করে জানিয়েছে যে তারা বরাত পেলে বছরে ১০ কোটি ডোজ প্রস্তুত করতে সক্ষম। (বিবিসি)

সেপ্টেম্বর ৯ ঃ ◈মানুষ হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে মস্তিষ্ক। আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা লাভ দীর্ঘ বিবর্তনের ফসল। এই বিবর্তনের পথ অতিক্রান্ত করতে আধুনিক মানুষ তার নিকটতম প্রজাতিদের (যথা নিয়ান্ডারথ্যাল) বহু যোজন পিছনে ফেলে এসেছে। আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কে মোট স্নায়ুকোষের সংখ্যা (প্রায় ৮৬০০ কোটি) তার নিকটতম প্রজাতির তুলনায় প্রায় ৩ গুণ। কেবল সংখ্যায় নয়, তার নিউরোনের কার্যক্ষমতা ও সংবেদনশীলতা অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় অনেক অনেক বেশি। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইন্সটিটিউট অব সেল মলিকিউলার বায়োলজির বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এক গবেষণা রিপোর্টে জানিয়েছেন যে মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত একটি জিনের সন্ধান তারা পেয়েছেন যা মস্তিষ্কের নিউরোন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। (সায়েন্স)

সেপ্টেম্বর ১৩ ঃ ◈বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা তাদের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানাচ্ছে যে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি জলবায়ু পরিবর্তনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে না। উপরন্তু, তা আরও খারাপ দিকে চলে যাচ্ছে। সত্বর সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারলে আগামী দিনে পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (রয়টার)

সেপ্টেম্বর ১৪ ঃ ◈বিভিন্ন স্বাস্থ্য-সংস্থা ও পরিবেশ বিজ্ঞানী বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম-জ্বালানীর হ্রাস করার লক্ষ্যে যে আওয়াজ তুলেছে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হু তাতে সামিল হয়েছে। একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সমাজ এক সুউচ্চ গিরিখাদের কিনারে অবস্থান করছে, যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে বিপর্যয়। জলবায়ু সংকট, বিশ্বউষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদির হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে এখুনি জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বন্ধ করা দরকার। বন্ধ করা দরকার পরমাণু যুদ্ধ, কারণ এগুলি সবই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। (সায়েন্স)

সেপ্টেম্বর ১৫ ঃ ◈আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভূপ্রযুক্তিবিদ, মেরু অঞ্চলের বরফের গলন প্রতিহত করার ও গলে যাওয়া বরফকে পুনরায় বরফে পরিণত করার জন্য এক অভিনব প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, দুই মেরু অঞ্চলের আকাশ জুড়ে সালফার-ডাই-অক্সাইডের কণা ছড়িয়ে দিলে তা বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস করবে ও গলন স্তব্ধ করবে

ও জল বরফে পরিণত হবে, আর এইভাবে ভূউষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলে গলে যাওয়া বরফ ফিরে পাওয়া যাবে। এইপ্রস্তাব প্রকাশ্যে আসার পর বিজ্ঞানীদের এক অংশ এর বিরোধিতা করে বলেছেন যে এটা ভূউষ্ণায়নের কারণ নয় বরং ফলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজনীয় ১৭৫০০০ উড়ান যে কয়েক মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করবে তার কী গতি হবে সে প্রশ্নও উঠেছে। তবে এই প্রস্তাব এখনো নাকচ হয়ে যায়নি। (স্কাই নিউজ)

সেপ্টেম্বর ১৯ ঃ ◈পৃথিবী থেকে ডাইনোসরের অবলুপ্তির কারণ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হল। সম্প্রতি এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে কেবলমাত্র গ্রহাণু বর্ষণের ফলে যে পৃথিবী থেকে ডাইনোসরের বিলুপ্তি ঘটেছে এমন নয়। ডাইনোসরের জীববৈচিত্রের হ্রাস ঘটেছে গণবিলুপ্তির কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ডাইনোসরের ডিমের জীবাশ্ম পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। (সিএনএন)

সেপ্টেম্বর ২৬ ঃ ◈মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা দ্বারা নির্মিত বিশেষ ধরণের মহাকাশ যান (DART) পৃথিবীর দিয়ে ধেয়ে আসা ডাইমরফস নামক একটি গ্রহাণুর গতিমুখ পরিবর্তন করতে সফল হয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটাতে সমর্থ্য হলেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসা গ্রহাণুটির সঙ্গে প্রায় ১১ মিলিয়ন কিমি দূরে সংঘর্ষ ঘটিয়ে তার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হল। (নাসা)

সেপ্টেম্বর ৩০ ঃ ◈মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ুবিজ্ঞানীরা 'সুপার নিউরোন' আবিষ্কার করেছেন। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন যে কিছু কিছু অশীতিপর (যাদের বয়স ৮০ বছরের বেশি) মানুষের স্মরণশক্তি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। মৃত্যুর পূর্বে মস্তিষ্কের তৎপরতা ও স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল এমন কিছু অশীতিপর মানুষের মস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গেছে তাদের স্মৃতিধারক স্নায়ু কোষের সংখ্যা ও গঠন পঞ্চাশ বছর বয়সী মানুষের সমতুল্য। এই সকল নিউরোন যার বয়স বাড়লেও বার্ধক্যের শিকার হয়নি এমন নিউরোনকে বিজ্ঞানীরা 'সুপার নিউরোন' নামে আখ্যা দিয়েছেন। এ বিষয়ে গবেষণা জারি আছে। (বিবিসি নিউজ)

অক্টোবর ৫ ঃ ◈এই বছরের বিজ্ঞান বিভাগের নোবেল পুরস্কার বিজেতাদের নাম ঘোষণা করল নোবেল কমিটি। শারীরবিদ্যা বা মেডিসিন বিভাগে পুরস্কার পেলেন সুইডিশ বিজ্ঞানী সিয়ান্তে পাবো। মানুষের নিকটবর্তী বিলুপ্ত পূবপুরুষের জিন অনুক্রম আবিষ্কারের জন্য তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

◈পদার্থবিদ্যা বিভাগে যৌথভাবে পুরস্কার পেলেন ৩ জন বিজ্ঞানী। ফরাসী বিজ্ঞানী অ্যালেন আস্পেক্ট, মার্কিন বিজ্ঞানী জন ক্লোসার ও অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী অ্যান্টন জেলিংগার। কোয়ান্টাম প্রযুক্তিতে অভাবনীয় অবদানের জন্য তাঁদের নোবেল প্রদান করা হয়।

◈রাসায়ন বিভাগে এই বছর নোবেল পুরস্কার যৌথভাবে পেয়েছেন মার্কিন বিজ্ঞানী ক্যারোলিন বার্তোজি, ড্যানিশ বিজ্ঞানী মর্টেন মেল্ডাল ও মার্কিন বিজ্ঞানী কার্ল সার্পলেস। ক্লিক কেমিস্ট্রি ও বায়ো-অর্থোগোনাল কেমিস্ট্রিতে অবদানের জন্য তাঁদের পুরস্কৃত করা হয়। (নিউইয়র্ক টাইমস)

অক্টোবর ৭ ঃ ◈অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয় ও চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন, আগামী ২০ থেকে ৩০ কোটি বছরের মধ্যে আমেশিয়া নামে এক অতি বিশাল মহাদেশ বা সুপারকন্টিনেন্ট গঠিত হতে যাচ্ছে। পৃথিবীর টেকটনিক সঞ্চালনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে গবেষকরা বলছেন যে বর্তমান পৃথিবীর প্রশান্ত মহাসাগরের অস্তিত্ব ক্রমশ লোপ পাবে ও মহাদেশগুলি আরো কাছাকাছি চলে আসবে। এর ফলেই সৃষ্টি হবে সুপারকন্টিনেন্ট। (সিএনএন)

অক্টোবর ১২ ঃ ◈স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল সম্প্রতি ইঁদুরের মস্তিষ্কে মানুষের স্নায়ুকোষ প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রতিস্থাপিত স্নায়ুকোষগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে প্রতিস্থাপনের কিছুদিনের মধ্যেই পোষক কোষের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে এবং মানব কোষগুলি সতেজ ও কার্যকরী রয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী অনুমান করছেন যে এই পদ্ধতিতে উচ্চ মেধাসম্পন্ন ইঁদুর তৈরী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন যে এই পদ্ধতিতে মানুষের মস্তিষ্ক জনিত রোগ ও প্রতিকারের পথ আরো সুগম হবে। এই গবেষণার ফলাফলে গবেষকেরা উৎসাহিত হলেও, কিছু আইনী প্রশ্ন উঠে এসেছে। যেমন, কৃত্রিমভাবে অ-মানুষী মেধা, চেতনা ইত্যাদি সৃষ্টি করা কি আইনসিদ্ধ? আলোচনা, বিতর্ক চলছে। (দ্য গার্ডিয়ান)

◈কলোরাডোর জাতীয় পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বিভাগের বিজ্ঞানীরা এক প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্যে **প্লাস্টিকের মিশ্রণকে ব্যবহারযোগ পদার্থে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রযুক্তিতে জৈবপ্রযুক্তির সাহায্যে তৈরী করা ব্যাক্টিরিয়া ও রাসায়নিক অনুঘটক ব্যবহার করা হয়েছে।** এই উদ্ভাবন সংশ্লেষণ জীববিদ্যা'র এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রসর হিসাবে

দেখছেন বিজ্ঞানীরা। (নিউ সায়েন্টিস্ট)

অক্টোবর ২০ ঃ ◈ডেনমার্ক ও গটেনবার্গ এর বিজ্ঞানীদের একটি দল উচ্চ গতিসম্পন্ন তথ্য প্রেরণ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। তথ্য প্রেরণের গতি ছিল এক পেটাবাইট/সেকেন্ড। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের এই কৃতিত্ব হল এই বিপুল পরিমাণ তথ্য প্রেরণ করতে তাঁরা একটি মাত্র লেজার ও একটিমাত্র অপটিক্যাল চিপ ব্যবহার করেছেন। (টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব ডেনমার্ক)

অক্টোবর ২১ ঃ ◈কার্বন রোবটিকস নামক একটি কোম্পানি কৃষিজমিতে আগাছা নির্মূলের জন্য একটি রোবট চালিত যন্ত্র বানিয়েছে যার নাম লেজারউইডার। এই যন্ত্রের বিশেষত্ব হল লেজার রশ্মি ব্যবহার করে এটি ঘন্টায় প্রায় ২ লক্ষ আগাছা নির্মূল করতে সক্ষম। এই যন্ত্র প্রায় ৮০ শতাংশ শ্রম লাঘব করে। আগাছানাশক ও সার ব্যবহারের প্রয়োজন না হওয়ার জন্য কৃষিতে উৎপাদন মূল্য ৮০ শতাংশ সাশ্রয় হয় পাশাপাশি খাদ্যের গুণমান অক্ষত থাকে। (টাইম)

অক্টোবর ২৪ ঃ ◈বৃটিশ সরকারের জাতীয় গণস্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে একটি গবেষণা সংঘটিত করা হয়েছে। এই প্রকল্পে পঞ্চাশ লক্ষ বৃটিশ নাগরিকের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে যাদের স্বাস্থ্য ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা করা হবে। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল নাগরিকদের বিশেষত প্রবীণ নাগরিকদের শরীরে রোগ বাসা বাঁধার আগেই তা চিহ্নিত করা ও সর্বোপরি সমস্ত মানুষকে বার্ধক্যে সুস্থ জীবন প্রদান করা। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এত বেশি সংখ্যক মানুষকে সংঘবদ্ধ করে এরকম গবেষণা পৃথিবীতে পূর্বে হয়নি। (বিবিসি নিউজ) ■

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নোবেল পুরস্কার ২০২২

১. শারীরবিদ্যা/ চিকিৎসা বিজ্ঞান

বিলুপ্ত হোমিনিন এবং মানব বিবর্তনের জিনোম সম্পর্কিত আবিস্কারের জন্য ২০২২ খ্রিস্টাব্দে শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন সুইডিশ বিজ্ঞানী স্যান্তে পাবো (Svante Paavo)। তিনি, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর ইভোলিউশনারি অ্যানথ্রোপলজির ডিরেক্টর। নিয়ান্ডারথালের জিনোমের অণুক্রম তৈরি করেছেন পাবো। বর্তমানে নিয়ান্ডারথালকেই মানুষের সবথেকে নিকটবর্তী বিলুপ্ত পূর্বপুরুষ বলে মনে করা হয়। হোমিনিন ডেনিসোভা-র আবিস্কারের কৃতিত্বও পাবোর। প্রথম পুরস্কারটি দেওয়া হল শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগে।

নোবেল পুরস্কার কমিটি বলেছে, "বিলুপ্ত হোমিনিন এবং মানব বিবর্তনের জিনোম সম্পর্কিত আবিস্কারের জন্য স্যান্তে পাবোকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পাবো আরও দেখেছেন যে প্রায় ৭০,০০০ বছর আগে আফ্রিকা থেকে অভিবাসনের পর এই বিলুপ্ত হোমিনিনদের থেকে হোমো সেপিয়েন্সে জিন স্থানান্তর ঘটেছে। বর্তমান মানুষের কাছে আজ জিনের এই প্রাচীন প্রবাহের শারীরবৃত্তীয় প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। কোনও সংক্রমণের মোকাবিলায় আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে তা প্রভাবিত করে এই প্রাচীন জিন প্রবাহ। পাবোর মূল গবেষণা একটি সম্পূর্ণ নতুন বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছে, প্যালিওজিনোমিক্স।"

২. রসায়ন

২০২২ খ্রিস্টাব্দে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিনজন বিজ্ঞানী। স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারোলিন বার্তোজ্জি (Carolyn R. Bertozzi), কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্টেন মেন্ডাল (Morten Meldal) ও আমেরিকার স্ক্রিপ্স রিসার্চের কার্ল ব্যারি সার্পলেশ (K. Barry Sharpless)। ক্লিক রসায়ন (Click Chemistry) ও বায়োঅর্থোগোনাল রসায়নের (Bioorhogonal Chemistry) বিকাশের অবদানের জন্য তাঁরা নোবেল পুরস্কার পেলেন।

৩. পদার্থবিজ্ঞান

২০২২ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী তিনজন বিজ্ঞানী হলেন ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী অ্যালাইন অ্যাসপেক্ট (Alain Aspect), মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী জন এফ ক্লজার (John F Clauser) ও অস্ট্রিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী অ্যান্টন জেলিঙ্গার (Anton Zeilinger), এন্ট্যাঙ্গলড ফোটন নিয়ে পরীক্ষা, বেল অসমাম্যতা লঙ্ঘন প্রতিষ্ঠা এবং কোয়ান্টাম ইনফরমেশন সায়েন্স এর অগ্রদূত হিসাবে তাঁরা এবছর নোবেল পেলেন।

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ত্রয়ী এন্ট্যাঙ্গলড কোয়ান্টাম অবস্থা ব্যবহার করে যুগান্তকারী পরীক্ষা পরিচালনা করেছেন, যেখানে দুটি কণা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও একক এককের মতো আচরণ করে। ফলাফলগুলি কোয়ান্টাম ইনফরমেশন এর উপর ভিত্তি করে নতুন প্রযুক্তির পথ প্রশস্ত করেছে। ■

বিস্মৃত বিজ্ঞানী ঃ

ননীগোপাল মজুমদার – বিস্মৃত পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানী

– নিবেদিতা হাজরা

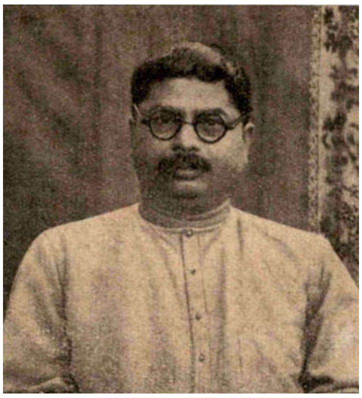

সত্যকে অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞানের অনিঃশেষ যাত্রা দুর্গম এবং বন্ধুর। সেই যাত্রাপথে গভীর ছাপ রেখে যাওয়া বহু বিজ্ঞানী বহুবিধ কারণে বিস্মৃতির অন্তরালে চাপা পড়ে যান। কেবল বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট শাখার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যেই শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমে জীবন্ত থাকেন। বিজ্ঞানকর্মীদের দায়িত্ব এমন বিজ্ঞানীদের তথা তাঁদের গবেষণা বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা।

পুরাতত্ত্ববিজ্ঞান মহলে এন.জি.এম নামে খ্যাত **ননী গোপাল মজুমদার** হলেন এমনই একজন। এবছর সিন্ধু সভ্যতা (ইন্দাস ভ্যালী সিভিলাইজেশন) আবিষ্কারের এক শতাব্দী পূর্ণ হল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর আধিকারীক প্রখ্যাত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মহেঞ্জো-দারো (বর্তমান পাকিস্তানে অবস্থিত)-তে ঐ সভ্যতার প্রত্ন নিদর্শন আবিষ্কারকে তথা তার প্রাচীনত্ব নির্ধারণকে সূচনা ধরা হয়। এর দুবছর আগে থেকেই হরপ্পায় (প্রায় ৭০০ কিলোমিটার উত্তরে) উৎখনন কাজ চালিয়ে প্রত্ন নিদর্শন উদ্ধার করা শুরু হয়। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই প্রত্নস্থল থেকে উদ্ধার সামগ্রী যে অনুরূপ তা নির্ধারণ করেন। এই আবিষ্কারই সেই যুগে অজানা – ব্রোঞ্জ যুগের সিন্ধু সভ্যতার অস্তিত্বের পাথুরে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে। স্বভাবতঃই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকৃতি পেয়েছেন বিজ্ঞানীমহলে এবং জনসমাজে।

সেই সময়ে প্রাপ্ত প্রমাণ থেকে মনে করা হত ঐ সময়কার সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৩৩০০ বছরের মধ্যের সময়কালে বর্তমান ছিল। বলা বাহুল্য সিন্ধু অববাহিকায় অতীতকে খুঁজে বার করার জন্য অভিযানঐ আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়নি। বরং এ.এস.আই-এর ডিরেক্টর জেনারেল জন মার্শালের নেতৃত্বে তারপর সিন্ধু ও বালুচিস্তানে অনেক অভিযান ও সর্বেক্ষণ (সার্ভে) চালানো হয় – যার জন্য হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর প্রত্নস্থল খুঁজে পাওয়ার প্রয়াসের মতই কষ্টকর এবং ধৈর্য্যশীল প্রয়াস প্রয়োজন ছিল। ননী গোপাল মজুমদার কেবল ঐ অনুসন্ধান আর সর্বেক্ষণের কারণেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ননীগোপাল মজুমদারের জন্ম ১লা ডিসেম্বর ১৮৯৭। বর্তমান বাংলাদেশের যশোরে। বাবা বরদাপ্রসন্ন, মা সরোজিনী। ১৯২০ তে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক পান। ১৯২৩-এ 'বজ্র' বিষয়ে গবেষণার জন্য গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার সহ পি.এইচ.ডি সম্পূর্ণ করেন। ঐ বছরই তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এ.এস.আই) এ যুক্ত হন। ইতিমধ্যেই তিনি রাজশাহীর 'বারেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি'র প্রদর্শনশালা বা যাদুঘরে কিউরেটর (তত্ত্বাবধায়ক) এর কাজ করেন। (এই প্রদর্শনশালার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্যান্যদের সাথে ছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) সাথে সাথে প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধারে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন ননীগোপাল।

এ.এস.আই-তে যুক্ত হওয়ার পর মজুমদারের দক্ষতায় প্রভাবিত হয়ে জন মার্শাল তাঁকে মহেঞ্জো-দারোর উৎখনন কাজে যুক্ত করেন। এএসআই-এর প্রাক্তন যুগ্ম নির্দেশক রবীন্দ্র সিং বিস্ট-এর মতে – যিনি নিজে সিন্ধু অববাহিকার অধ্যয়নে বিশেষজ্ঞ ছিলেন – মার্শাল এই তরুণকে এতই পছন্দ করতেন যে মহেঞ্জোদারোর উৎখননের সময় নিজে হাতে ধরে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় এরপর সরাসরি তাঁকে সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে উন্নীত করা হয়। চার বছরের মধ্যে তিনি এএসআই-এর সেন্ট্রাল সার্কেল এর সুপারিনটেনডেন্ট হন। এ কথা এজন্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটিশ কর্তাদের আধিপত্যাধীন সংস্থায় সে যুগে 'দেশীয়' ব্যক্তির সুপারিনটেনডেন্ট পদমর্যাদা লাভ অসাধারণ কৃতিত্বরূপে গণ্য হত। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কলকাতাস্থিত মুখ্য কার্যালয়ে সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে বদলী করা হয়। তা সত্ত্বেও তাঁকে বার বারই সিন্ধু প্রদেশে উৎখনন ও অভিযানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়।

১৯২৭-এ তিনি প্রথমবার সিন্ধু প্রদেশে উৎখনন ও সর্বেক্ষণের কাজ চালান। অতি অল্প অনুদান সম্বল করে ১৯২৭-২৮-এ তিনি মহেঞ্জো-দারোর কাছে ঝুকার এ কাজ চালান। মার্চ ১৯৩০-এ তিনি দুটো নতুন প্রত্নস্থল আবিষ্কার করে উৎখনন চালান। একটা থারো পাহাড়ে – অন্যটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ – চানহু-দারোতে। অক্টোবর ১৯৩০-এ মহেঞ্জো-দারো থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে কিরথার পাহাড় বরাবর যাত্রা শুরু করেন। মার্চ ৩১শে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি ৩২টা প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল আবিষ্কার করেন। ১৯৩৮-এ

আবার তাঁকে ছ'মাসের জন্য ডেপুটেশনে পাঠানো হয় মহেঞ্জো-দারোর ১৪০ কিলোমিটার উত্তরে সিন্ধু প্রদেশের জোহী-তে অভিযানের নেতৃত্ব দিতে।

রবীন্দ্র সিং বিস্ট-এর মতে তিনি মোটের ওপর ৬২টা প্রত্নস্থল আবিষ্কার করেন – যার মধ্যে রয়েছে ঝুকর, আমরী ও চানহু-দারো। মজুমদারের আবিষ্কারের আসল তাৎপর্য হল এর ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয় যে **প্রাক-হরপ্পা সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল – যা সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীনত্বকে ৩৩০০-১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে পিছিয়ে ৪৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ও আগেকার কালে স্থাপন করে।** (এক শতাব্দী আগে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের আগে অনুমান করা হত তথাকথিত 'আর্য' জাতির আগমন ও 'বৈদিক' সভ্যতাই – যা ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ধারে কাছে বিকশিত হয়েছিল – এই হল ভারতীয় উপমহাদেশে সভ্যতার সূচনাকাল।) ননীগোপাল মজুমদারের নেতৃত্বে আবিস্কৃত 'আমরী' প্রত্নস্থল (যা মহেঞ্জো-দারোর প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত) প্রায় ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগের প্রাক হরপ্পা ও আদি হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন বহন করে। আমরী'তে তাঁর আবিষ্কার করা মাটির পাত্র তাম্র-প্রস্তর যুগের নিদর্শন বহন করে। মহেঞ্জো-দারোর সামান্য উত্তরে দুটো পৃথক সময়ের সভ্যতার স্তর বিন্যস্ত ধ্বংসাবশেষ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন অনন্য দক্ষতার মধ্যে দিয়ে। এখান থেকে আবিষ্কার করা মাটির পাত্র ও নিদর্শন তাম্র-প্রস্তর যুগের। চানহু-দারো তাঁর আরেক স্মরণীয় আবিষ্কার এর অবস্থার মহেঞ্জো-দারোর ১৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ বছর থেকে পরবর্তী সময়ে উন্নত কৃষি ও নগর ভিত্তিক সভ্যতার কেন্দ্র ছিল চানহু-দারো। এই ক্ষেত্রের গুরুত্ব এতটাই যে ১৯৩১-এ মজুমদারের খননের পর ১৯৩৪-৩৬-এ আর্নেস্ট ম্যাকে'র নেতৃত্বে মার্কিন প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের দল পাকিস্তানের মহঃ রফিক মোঘল এবং ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে অর দিদিয়ের নেতৃত্বে ফরাসি দল উৎখনন চালিয়েছেন। এখান থেকে বিশেষ ধরনের শিলমোহর আবিষ্কার হয়েছে। মনে করা হয় এখানে শিলমোহর তৈরি করা হত। মূলতঃ মাটির দ্রব্যাদি নির্মাণের কর্মশালার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার হয়েছে এছাড়া আবিস্কৃত হয় তামার কুড়ুল, বর্শা, ছুরি ইত্যাদি। শিলমোহরে খোদিত লিপি যা হরপ্পা লিপি নামে খ্যাত এবং যার পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি – সেই কাজ শুরু করেছিলেন প্রাচীন লিপি পাঠে (বিশেষত ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী) বিরল দক্ষতার অধিকারী ননীগোপাল মজুমদার।

মজুমদারের প্রতিভা এর মধ্যেই সীমিত ছিল না। প্রাক খনন সমীক্ষা এবং খননকৌশলের ক্ষেত্রে তাঁর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরবর্তী যুগের পশ্চিমী প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানীরাও অনুসরণ করে থাকেন। রবীন্দ্র সিং বিস্ট উল্লেখ করেছেন ১৯২৭-৩১ পর্যায়ে মজুমদারের লেখা 'এক্সপ্লোরেশন ইন সিন্ধু' শিরোনামের রিপোর্ট প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানীদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদায় আসীন। একইভাবে শিলালিপি পাঠে তাঁর বিরল দক্ষতা প্রকাশিত হয়েছে 'ইন্স্ক্রিপশন অফ বেঙ্গল'-এ। জন মার্শাল তাঁর 'মনুমেন্টস অফ সাঁচী'র (সাঁচীর স্তুপ) শিলালিপি বিষয়ক অধ্যায়গুলি রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন মজুমদারকে। কলকাতায় থাকাকালে তিনিই প্রথম ভারতীয় জাদুঘর বা মিউসিয়ামের প্রাগৈতিহাসিক গ্যালারিগুলিকে ক্যাটালগ তৈরি করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করেন। প্রত্নতত্ত্বের প্রায় সমস্ত শাখাতেই ছিল তাঁর অগাধ পান্ডিত্য। ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানে অবদানের জন্য তাঁকে তাঁর পেশাদার জীবনের দু'দশক পূর্ণ হবার আগেই রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির তরুণতম ফেলো হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এহেন ননীগোপাল মজুমদারের অমূল্য জীবন শেষ হয়ে গেল ডাকাতের গুলিতে! ১৯৩৮-এর ১লা অক্টোবর তিনি সিন্ধু প্রদেশে কাজ শুরু করেন কির্থার রেঞ্জের পাদদেশ এবং সংলগ্ন মালভূমি ও সমতলভূমিতে। তিন সপ্তাহে তাঁর নেতৃত্বে প্রায় আধ ডজন চালকোলিথিক বা তাম্র যুগের প্রত্নস্থলে খননকার্য চালানো হয়। ১১ই নভেম্বর সকালে এক দস্যুদল ক্যাম্প আক্রমণ করে। গুলিতে একাধিক সদস্য আহত হন এবং ননীগোপাল মজুমদারের মৃত্যু হয়। প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী দস্যু দলের ধারণা হয়েছিল এই প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে প্রাচীন যুগের গুপ্তধন রয়েছে। কিন্তু এ.এস.আই-এর উচ্চপদস্থ কর্তার মৃত্যুর পরদিনই দেহ দাহ করে দেওয়া, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট এবং তাঁর জিনিষপত্র পরিবারের হাতে তুলে না দেওয়া এবং পরবর্তীকালে এ.এস.আই-এর নিস্পৃহ অবস্থান বিভিন্ন প্রশ্ন ও সন্দেহের উদ্রেক করে। তথ্য এটাও বলে যে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বালুচিস্তানের কালাত দস্যুদের চিহ্নিত করে বিচার মারফৎ যাবজ্জীবন কারাদন্ডের ব্যবস্থা করে।

সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক আজিজ কিংগ্রাণী ব্যক্তিগত উদ্যোগে মজুমদারের হত্যা সম্পর্কিত বিষয়ে অনেক চেষ্টা করেও হত্যা মামলা ও আদালতের দস্তাবেজ উদ্ধার করতে সক্ষম হননি। তিনি লিখেছেন "অবিভক্ত ভারতের পশ্চিম প্রদেশ সিন্ধু সে সময় প্রত্ন অভিযানের দিক থেকে ছিল নতুন-অজানা। পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানে পথ প্রদর্শক অবদানের জন্য মজুমদারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে আবার দাদু-তে তাঁর হত্যাকান্ডের জন্য গভীর পীড়া অনুভব করে।" ২০১১-তে আজিজ কিংগ্রানি ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের সাহায্যে ননীগোপাল মজুমদারের হত্যাকান্ড যেখানে সংগঠিত হয় সেই রোহিল জে কুন্ডে স্মৃতিফলক স্থাপন করে এসেছেন। সেই ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে "... সিন্ধু তথা সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাঁর অবদানকে শতাব্দীর পর শতাব্দী স্মরণে রাখবে। তাঁর কর্মপদ্ধতি পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আগামী প্রজন্মের

➔

সংগঠন সংবাদ ঃ

সুন্দরবনে লাগাতার ঝড়-প্লাবন-জনতার দাবি স্থায়ী সমাধান

সুন্দরবন হল পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল। ভারত (পশ্চিমবঙ্গ) ও বাংলাদেশের দক্ষিণে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর জমি নিয়ে এই অঞ্চল বিস্তৃত। ভারতে এই সুন্দরবনের ৪০ শতাংশ (প্রায় ১০ হাজার বর্গ কিমি) অঞ্চল পড়েছে। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে মানুষ বসতিস্থাপন করেছে বিগত শতাব্দীর শুরু থেকে। এই অঞ্চলে বাঘ, কুমীর সহ হিংস্র জানোয়ারের সাথে মানুষকে যেমন লড়াই করতে হয় তেমনই লড়তে হয় সমুদ্র ঝড় এবং প্লাবনের সাথে।

২০২১ খ্রিস্টাব্দে ইয়াসের (২০২১-এর ঘূর্ণিঝড়) পরবর্তীকালে সুন্দরবনের **পাথরপ্রতিমা ব্লকের গোপালনগর, পাথরপ্রতিমা** এবং **ব্রজবল্লভপুর** অঞ্চলে বিপদে মানুষের পাশে থাকার পাশাপাশি আমরা অনুসন্ধান কার্যকলাপ চালাই এবং সমস্যা সমাধানে জনগণের অভিমত সংগ্রহ করি।

১. গোবিন্দপুর আবাদ ঃ– এটি ব্রজবল্লভপুর অঞ্চলের রাক্ষসখালি দ্বীপের অন্তর্গত। দ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের মোহনার কাছাকাছি। এখানে আমফান (২০২০-র ঘূর্ণিঝড়) এর সময় নদীবাঁধ (river enbankment) ভেঙে প্লাবন হয়েছিল। প্লাবিত অঞ্চলে যেখানে শাসক পার্টির নেতাদের প্রভাব, ত্রাণের টাকা সেখানেই মূলত বন্টন হয়েছে অন্যত্র নয়, এই নিয়ে ক্ষোভ আছে তবে নেতাদের ভয়ে চাপাস্বরে। আয়লার (২০০৯-এর ঘূর্ণিঝড়) এর সময় থেকে জমি অধিগ্রহণ হলেও নদীবাঁধ (আয়লা বাঁধ) হয়নি। এখানকার বর্তমান নদীবাঁধে একটা সময় নামমাত্র মেরামতি (ব্লক পিচিং) করা হলেও কালের নিয়মে প্রায় খাড়া (ইংরাজির I আকৃতির) বাঁধ ধ্বসে গেছে। বর্তমানে বাঁধের জিওচট তুলে ক্ষয় ভরাট চলছে। বঙ্গোপসাগর থেকে সমুদ্রের ঢেউ সরাসরি বাঁধে আঘাত করে বলে অবৈজ্ঞানিক বাঁধের স্থিতিশীলতা কম। পাকা নদীবাঁধ তৈরির দাবি থাকলেও মানুষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য সন্ত্রাসের পরিমন্ডলে পিছিয়ে আছে।

২. গোপালনগর ঃ– অঞ্চলের পূর্বদিকে নদী পশ্চিমপাড় বরাবর ক্ষয়কার্য চালাচ্ছে এবং পূর্বপাড় বরাবর পলিসঞ্চয় করছে। ১৯৯০, ১৯৯৫ এবং ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সব মিলিয়ে পাঁচবার নদীবাঁধ ভেঙেছে। এখানেও নদীবাঁধ সঠিক বৈজ্ঞানিক (ইংরাজির V বা উল্টো Λ) আকৃতির নয়। মোট ৩৫০০ ফুট দীর্ঘ নদীবাঁধের মধ্যে মাত্র ১০০০ ফুট পাকা হয়েছে। এলাকার মানুষের বক্তব্য নদী যেহেতু পশ্চিমপাড়ে ক্ষয়কার্য চালাচ্ছে তাই সঠিকভাবে পাইলিং না করলে বাঁধ প্লাবনের সময় টিঁকবে না। বাঁধ সংলগ্ন জমি ও ঘরবাড়ি ধীরে ধীরে নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে। এখনও দুটি পরিবার সঠিক ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় প্রকল্পিত রিং বাঁধের উপর তাদের জমি ছেড়ে যায় নি। এই নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে (যারা জমি ছেড়ে বিকল্প জমিতে গেছেন ও যারা যান নি) দ্বন্দ্ব আছে। বাঁধের রাস্তার ধারে ঝড়প্রতিরোধী গাছ এবং ম্যানগ্রোভ নাই।

৩. পশ্চিম দ্বারকাপুর ঃ – পাথরপ্রতিমা অঞ্চলের পশ্চিমে অবস্থিত। ইয়াসে প্লাবন হয়। নদীবাঁধের পাড়ে বিরাট চর (অর্থাৎ নদী পশ্চিমপাড়ে পলি সঞ্চয় করছে ও পূর্ব পাড়ে বা উল্টোদিকে ক্ষয় চালাচ্ছে)। নদীর পশ্চিম পাড়ে আদিবাসী শবর গোষ্ঠীর বসবাস। এই চরে শবররা ফিসারি (মাছ চাষ) করে ফলে তারা চরের পশ্চিম দিকে উঁচু করে বাঁধ দিয়েছেন। বর্তমানে এটাই বাস্তবে নদীর পাড় (পশ্চিম)। বর্তমানে যে বাঁধটি নদীবাঁধ সেখানে ইঁট পাতার সময় (ইয়াসের ঠিক আগে) তাকে চওড়া করার জন্য মূল নদীবাঁধ থেকে

➔

●*ননীগোপাল মজুমদার – বিস্মৃত পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানী*

কাছে পথপ্রদর্শক প্রদীপের কাজ করে যাবে। তাঁর মৃত্যুহীন কীর্তিকে আমরা সেলাম জানাই।”

কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত বা কে. এন. দীক্ষিত পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক দিকপাল ব্যক্তিত্ব। যিনি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দেই এএসআই-এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে আসীন হন। তিনি তাঁর গবেষণা গ্রন্থ ‘সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা’ উৎসর্গ করেছিলেন ননীগোপাল মজুমদারকে। যাতে লেখা ছিল ‘প্রতি এন. জি. মজুমদার, সিন্ধের প্রাগৈতিহাসিক পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানের স্বার্থে শহীদ, দিনাংক ১১.১১.১৯৩৮’।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক বিভাজন হয়ত পরবর্তী সময়ে ননীগোপাল মজুমদারকে বিস্মৃত হওয়ার আরো একটা কারণ! ‘সিন্ধু’ ওদের আর লোথাল-ঢোলাভীরা আমাদের – এমন বিজ্ঞান বিরোধী চিন্তাধারা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বৈজ্ঞানিক সংস্থান সমূহে না থাকাটাই আশ্চর্য। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবিষ্কার এই কল্পকাহিনীর ইতি টেনে দিয়েছিল যে ভারতীয় উপমহাদেশে বৈদিক যুগের আগে কোন সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল না। ননীগোপাল মজুমদারের আবিষ্কার আদি হরপ্পা যুগের সভ্যতার প্রাচীনত্বকে মিশর ও সুমেরীয়দের সমকক্ষ করে তুলেছিল। ননীগোপাল মজুমদারের জন্মের ১২৫ বর্ষ পূর্ণ হল এবছর।■

কৃতজ্ঞতা স্বীকার –

** ডন. ৩১শে জানুয়ারি ২০১১, অধ্যাপক আজিজ কিংগ্রানি*

** ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০২২ ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ এবং ‘দেশ’ ১৭ই নভেম্বরে প্রসূন চৌধুরি লিখিত নিবন্ধ ও অন্যান্য*

মাটি কেটে তাকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ইয়াসের সময় জলোচ্ছাস বাঁধ টপকে এলাকাকে প্লাবিত করে। এখানকার নদীবাঁধও খাড়া, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন ঢাল নেই।

এলাকার মানুষের পাকা নদীবাঁধের দাবি বহুদিনের। গত বর্ষার ঠিক আগে (মে ২০২২) কাজ চালানোর মত বাঁধের মেরামতি হয়েছে। পরের ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবনে তা না টেঁকার সম্ভাবনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এলাকার আদিবাসী পাড়ায় নলকূপের সমস্যা আছে। প্রতিবাদ ওঠায় সম্প্রতি

তা করে দেওয়া হয়েছে।

সমগ্র অঞ্চলের বিভিন্ন নদীর গতিপথ, স্রোতের তারতম্য, ক্ষয় ও পলি সঞ্চয়ের প্রকৃতি, ম্যানগ্রোভের উপস্থিতি, নদীর পাড়ে মানুষের বসতির দূরত্ব ইত্যাদি নিয়ে আমরা বিস্তারিত অনুসন্ধান চালাচ্ছি। আগামী সংখ্যায় স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কি কি বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট দাবি দাওয়া আমরা সমীক্ষণের পাতায় তুলে ধরব একটি বৃহত্তর গণআন্দোলন বিকাশের লক্ষ্যে। ■

মজদুর অধিকার সংঘর্ষ অভিযানে বিজ্ঞান মনস্ক

সংসদে পাশ হওয়া শ্রমিক বিরোধী চার শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে, দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ও সংগ্রামের নিঃশর্ত অধিকারের দাবিতে, ঠিকা প্রথার অবসানের দাবিতে, গিগ-প্ল্যাটফর্ম-আশা-অঙ্গনওয়ারি-মিড ডে মিল-আইটি-আইটিএস, গৃহশ্রমিকসহ সকলের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি ও অধিকারের দাবিতে, দৈনিক ন্যূনতম ১০০০ টাকা মজুরির দাবিতে, সমস্ত গ্রামীণ শ্রমিকদের সারা বছর কাজের গ্যারান্টির দাবিতে – দেশের বিভিন্নপ্রান্তের শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মজদুর অধিকার সংঘর্ষ অভিযান (মাসা) গড়ে তুলেছেন। উপরোক্ত দাবিতে গত ১৩ই নভেম্বর ২০২২, দিল্লীর রামলীলা ময়দান থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন দিতে যায়। উক্ত কর্মসূচীর প্রচারে এবং দিল্লীর বিক্ষোভ মিছিলে আমাদের কর্মীরাও অংশগ্রহণ করেন। ■

রাস উৎসবে শব্দদূষণ ও অপসংস্কৃতির তান্ডবের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মনস্ক

গত ১লা নভেম্বর এপিডিআর নবদ্বীপ শাখা, জনস্বাস্থ্য অধিকার মঞ্চ, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ-র স্থানীয় শাখা যৌথভাবে রাস উৎসবে বাজি পোড়ানো, ডি জে বাজানো, চরম অপসংস্কৃতি ও মদ্যপানের পর উচ্ছৃঙ্খলতা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এক ডেপুটেশন দেয়। এরপর বিকালে স্থানীয় বাসস্ট্যান্ডে একটি জনসভায় যৌথমঞ্চের বক্তব্য তুলে ধরা হয়। এই যৌথ কর্মসূচীতে সাধারণ মানুষের এক বড় অংশের সমর্থন পাওয়া যায়। ■

চিকিৎসক বিজ্ঞানী ডাঃ দিলীপ মহালানবীশের জীবনাবসান

গত সংখ্যায় আমরা 'কলেরা' ডায়রিয়ার ... অখ্যাত চিকিৎসকের মানবতার ফল' শীর্ষক যে রচনায় চিকিৎসক ডাঃ দিলীপ মহলানবীশের অসামান্য কাজের পরিচয় দিয়েছিলাম সেই ডাঃ দিলীপ মহলানবীশ গত ১৬ই অক্টোবর ২০২২ কলকাতায় মারা গেলেন। আমরা তাঁর মহান কীর্তিকে বিনম্রত্তে স্মরণ করি।

–ঃ ভ্রম সংশোধন ঃ–

সম্পাদকীয় নিবন্ধে ভুল বশত লেখা হয়েছিল "গত ১৪ই অগাস্ট রাজস্থানের ... হারিয়েছে। খবরে প্রকাশ, গত ২০শে অগাস্ট স্কুল চলাকালীন ... জলপান করে"। এই দুইটি তারিখ হবে ১৪ই জুলাই এবং ২০শে জুলাই।

ধারাবাহিক পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞানরচনায় ১০ পৃষ্ঠায় 'পরিবেশের পজিটিভ ও নেগেটিভ ফিটব্যাক' কথাটি লেখা হয়েছে। ওই প্যারায় আরও কয়েকবার পজিটিভ ও নেগেটিভ ফিটব্যাক কথা লেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে ফিটব্যাক শব্দটির বদলে 'ফিডব্যাক' শব্দ হবে।

সহযোগিতা রাশি ঃ ১৫.০০ টাকা
Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

মহাবিশ্বের রহস্য-কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে আলোচনা সভা

মহাবিশ্বের রহস্য-কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী তথা বিজ্ঞান কর্মীদের নিয়ে গত ২২শে অক্টোবর, ২০২২ কলকাতার ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে এক আলোচনা সভা হয়। এই আলোচনা সভায় বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় শাখার কর্মীরা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে মহাবিশ্বের রহস্য সন্ধানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিষয় এবং কৃষ্ণগহ্বর আসলে কি তা তুলে ধরেন। এই আলোচনা বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি অনুধাবন করতে সাহায্য করেছে বলে উপস্থিত দর্শকদের মধ্য থেকে মন্তব্য উঠে আসে।■

সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপন

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর (নতুন ক্যালেন্ডার অনুসারে ৭ই নভেম্বর) রাশিয়ার বুকে প্রথম দুনিয়ার সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল। এই বিপ্লব সোভিয়েত সমাজে কি পরিবর্তন এনেছিল এবং বর্তমান সমাজের সমস্যাগুলি সমাধানে এই পথে এগিয়ে গিয়েই কেন মানব সমাজের বিকাশ ঘটতে পারে তা নিয়ে ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ এবং কয়েকটি শ্রমিক, ছাত্র, গণতান্ত্রিক সংগঠনের সঙ্গে গড়ে ওঠা অক্টোবর বিপ্লব উদযাপন আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রচারে আমাদের সংগঠনও অংশগ্রহণ করেছে। সামাজিক মাধ্যমে এই উপলক্ষ্যে সংগঠন যে বিবৃতি প্রকাশ করেছে তা নিম্নরূপ ঃ

সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব কেন চিরস্মরণীয়

* অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীর বুকে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসানের সূচনা করেছিল।

* এই বিপ্লবই সোভিয়েত সমাজে অনাহার-দারিদ্র-বেকারত্ব-চিকিৎসাহীনতা-দেহ বিক্রির ন্যায় পুঁজিবাদী সমাজের দগদগে ঘাগুলি চিরতরে নির্মূলের পথ দেখিয়েছিল।

* জীবনের সবক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি শুধু নয়, তার স্থাপনা করেছিল।

* বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি মুষ্টিমেয়র জন্য নয়, সমাজের সকলের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

* সকলের জন্য কাজ পাওয়ার অধিকার-শিক্ষার অধিকার-বার্ধক্য ও কর্মে অসমর্থ হলে ভরণপোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

* ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয় হলো এবং নাগরিকদের ধর্ম (religion) বিরোধী প্রচারের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল।

* অলৌকিকবাদ-অপবিজ্ঞানের অবসান এবং যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের প্রসারের সার্বিক সূচনা হয়েছিল।■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, ১৭৮/এন, বাসুদেবপুর রোড, ঐক্যতান ক্লাবের (বকুলতলা) নিকটে কলকাতা - ৭০০০৬১, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : https://samikshan.com